এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. মনিরুজ্জামান

ডা. আতাউর রহমান

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

www.quantummethod.org.bd

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. মনিরুজ্জামান
ডা. আতাউর রহমান

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩৯৬৮১৫, ৮৩৯১৩৯১
০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭৪০-৬৩০৮৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

প্রথম প্রকাশ

১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

মুদ্রাকর

উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

২০০ টাকা

Angioplasty O Bypass Surgery chharai
Hridrog Niramoy O Protirodh

(Prevention & Cure of Heart Disease without
Angioplasty & Bypass Surgery)

Published by

Quantum Foundation
www.quantummethod.org.bd

Price : 30 $

উ | ৎ | স | র্গ

সঠিক জীবনদৃষ্টি ও
সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করে
সুস্থ সুন্দর ও স্বাভাবিক
জীবনযাপন করছেন যারা,
হৃদরোগ-জয়ী
কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের
সেইসব সদস্যের প্রতি–

এনজিওপ্লাস্টি ও
বাইপাস সার্জারি ছাড়াই

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ

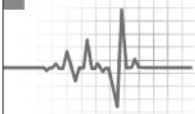

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব

সূচিপত্র

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম	৯
জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান	১৩
জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক	১৭
ডা. হাসনাইন নান্না	২১
হৃৎপিণ্ড পরিচিতি ॥ করোনারি হৃদরোগ	২৯
ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি, টেনশন ও স্ট্রেস ॥ করোনারি হৃদরোগের অন্যতম কারণ	৩৯
করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা ॥ এর ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতা	৫৭
নতুন আশা নতুন বিশ্বাস ॥ সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস হৃদরোগ নিরাময় করে	৭১
মন ও মস্তিষ্কের সুসমন্বয় নিরাময় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে	৮৩
মেডিটেশন হৃদরোগ নিরাময় করে	৯৫
কোয়ান্টাম ব্যায়াম করুন ॥ নিয়মিত হাঁটুন	১০৫
সুস্থতার আসল রহস্য ॥ কার্যকর রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা	১৩৩
হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে চাই বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস	১৩৯
ধূমপান ॥ নীরবে বাড়িয়ে চলে হৃদরোগের ঝুঁকি	১৫৫
গ্রুপ সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং ॥ আপনি একা নন	১৬১
শোকরগোজার হোন ॥ এগিয়ে যান সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে	১৬৫
কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবে আসুন	১৭১

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ

নিজের দায়িত্ব নিজে নিন

হৃদরোগ বলতে সাধারণভাবে করোনারি হৃদরোগকেই বোঝানো হয়। বিশ্বে প্রতিবছর দেড় কোটিরও বেশি মানুষ এ রোগে মৃত্যুবরণ করে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পাশ্চাত্যে মোট মৃত্যুর শতকরা ৪৫ ভাগই ঘটে হৃদরোগে। আর পাশ্চাত্যের অন্ধ-অনুকরণ ও ভ্রান্ত জীবনাচারের ফলে বাংলাদেশসহ প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এ রোগের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে আগামী দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে এটি মহামারি আকারে দেখা দিতে পারে।

করোনারি হৃদরোগের অনেক অত্যাধুনিক চিকিৎসা এখন বিশ্বজুড়ে প্রচলিত–এনজিওপ্লাস্টি, বাইপাস সার্জারি, রোবোটিক সার্জারি ইত্যাদি। কিন্তু খোদ চিকিৎসকরাই বলছেন, সমস্যা থেকে যাচ্ছে সমস্যার জায়গাতেই। আর এসব চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর পুনঃব্লকেজও প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীরা একটি রোগচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন।

গত শতকের শেষের দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. ডিন অরনিশ সর্বপ্রথম এর কার্যকর সমাধানটি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। প্রাচ্যের সাধকদের হাজার বছরের জ্ঞান-উপলব্ধির সাথে তিনি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক চমৎকার সমন্বয় ঘটান। হৃদরোগীদের লাইফস্টাইল বা জীবনযাপন পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে তিনি উদ্ভাবন করেন করোনারি হৃদরোগের ফলপ্রসূ চিকিৎসাপদ্ধতি। অরনিশের উদ্ভাবনকে স্বীকৃতি দিয়ে বিশেষ গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন, ল্যানসেট ও আমেরিকান জার্নাল অব কার্ডিওলজির মতো বিশ্বের প্রথমসারির চিকিৎসা-সাময়িকীগুলোতে। এভাবেই এর অন্তর্ভুক্তি ঘটে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলধারায়।

আসলে সুস্থতা ও নিরাময়ের জন্যে সুস্থ জীবনাচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ক্রমাগত ভুল জীবনযাপনের ফলে যে রোগের সূত্রপাত, জীবন-অভ্যাস পরিবর্তনই হতে পারে তার প্রকৃত সমাধান। পৃথিবীজুড়ে নতুন ধারার চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা তাই একবাক্যে বলছেন, সুস্থ জীবনের জন্যে সুস্থ জীবনাচারের কোনো বিকল্প নেই। আর এ ব্যাপারে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

গত দুদশক ধরে দেশে সচেতনতা সৃষ্টি করে আসছে। সে ধারাবাহিকতায় আরো সমন্বিতভাবে কাজ শুরু করেছে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে মূলত ছয়টি বিষয়ের সুসমন্বয়ে; সেগুলো হলো–সঠিক জীবনদৃষ্টি, মেডিটেশন, বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস, কোয়ান্টাম ব্যায়াম, নিয়মিত হাঁটা এবং কাউন্সেলিং। আমরা দেখেছি, এ বিষয়গুলোর প্রতিটিতেই যারা সমান মনোযোগ দিয়েছেন এবং অনুসরণে আন্তরিক থেকেছেন, তারা ক্রমশ হয়ে উঠেছেন আগের চেয়ে সুস্থ প্রাণবন্ত ও কর্মোদ্যমী।

এমনও হৃদরোগী আছেন, এনজিওগ্রামে যার হৃৎপিণ্ডে ৭০ থেকে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত ছয়টি ব্লকেজ শনাক্ত হয়েছিলো এবং হাঁটাচলা তো দূরে থাক, বরং প্রাত্যহিক ছোটখাটো কাজকর্ম করতে গিয়েও যিনি তীব্র বুক ব্যথায় আক্রান্ত হতেন, তিনিই এখন সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করে বেশ ভালো আছেন। একজন পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতোই প্রতিদিন এক ঘণ্টা পার্কে হেঁটে বেড়াচ্ছেন তারুণ্যদীপ্ত গতিতে।

সুস্থতার এ আনন্দ-অনুরণন সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতেই কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব প্রকাশ করেছে 'এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ' বইটি। আমরা বিশ্বাস করি, এ বইটি আপনার ও আপনার হৃৎপিণ্ডের মাঝে একটি সেতুবন্ধন রচনা করবে। সেইসাথে আপনি লাভ করবেন সার্বিক মনোদৈহিক সুস্থতার এক অনবদ্য সুখানুভূতি।

প্রিয় সুহৃদ, জীবন আপনার। দেহ-মন আপনার। এই জীবনকে সুন্দর করার, দেহ-মনকে সুস্থ রাখার দায়িত্বও আপনারই। তাই সুস্থতার ব্যাপারে বিশ্বাসী হোন। সচেতনভাবে উদ্যোগী হোন। আজ থেকেই প্রতিদিন একটু একটু করে সুস্থ জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠুন। আপনি সুস্থ থাকবেন।

আমরা আপনার সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা ও সাফল্য কামনা করি।

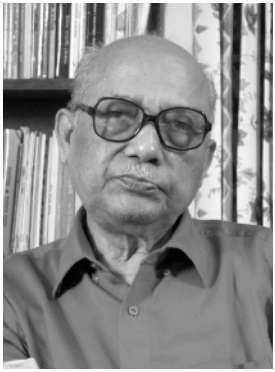

প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও বাংলাদেশে ধূমপানবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব প্রকাশিত হৃদরোগ নিরাময়ে বিশেষ মেডিটেশন সিডির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এ বক্তব্য দেন।

প্রশান্তি ও সুস্থ জীবনাচার হৃদরোগ নিরাময় করে

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

হৃৎপিণ্ডের যত ধরনের অসুখ রয়েছে তার মধ্যে করোনারি হৃদরোগ অন্যতম। ধূমপান, চর্বিযুক্ত খাবার, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ইত্যাদি এ রোগের অন্যতম কারণ। প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় শুধুমাত্র ওষুধ, এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস অপারেশনের মাধ্যমে রোগীর ব্লকেজের চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু চিকিৎসক-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, অত্যধিক মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা হৃদরোগের একটি অন্যতম প্রধান অনুঘটক, যার কোনো সমাধান প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় নেই।

এছাড়াও অপারেশনের পর রোগী যখন আবার ধূমপান, ভাজাপোড়া ও তৈলাক্ত খাবারসহ পুরনো জীবনযাত্রায় ফিরে যায়, সে আবারও আক্রান্ত হয় হৃদযন্ত্রের নানা জটিলতায়। তাই হৃদরোগ থেকে পরিপূর্ণ নিরাময়ের জন্যে প্রয়োজন ধূমপান বর্জন, জীবনধারায় পরিবর্তন এবং টেনশনমুক্ত জীবন। আমিও আমার রোগীদেরকে এসব ব্যাপারে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিই।

টেনশনমুক্ত প্রশান্ত জীবনের জন্যে মেডিটেশনের ভূমিকা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। মেডিটেশন ও জীবনাচার পরিবর্তনের মাধ্যমে যারা হৃদরোগ মুক্ত হয়েছেন আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। এদের মধ্যে অনেকেই

অপারেশন-পরবর্তী জটিলতায় আক্রান্ত হতে পারতেন। কিন্তু তা হন নি; বরং সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাটি তারা নিতে পেরেছেন।

অপারেশনকে ভয় করেন না এমন মানুষ নেই, তাই অপারেশনের চেয়ে ঝুঁকিহীন এমন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সুস্থ হওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। হৃদরোগ থেকে মুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের নিজেদের বক্তব্যেই আমি শুনেছি। সৎ সাহস না থাকলে এ কথাগুলো তারা এত সহজে বলতে পারতেন না। সত্য বলেই সৎ সাহস ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এ কথাগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। আর সত্য বলতে কোনো ভয় থাকা উচিত নয়। কারণ সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানসিক প্রশান্তি ও সুস্থ জীবনধারা হৃদরোগ নিরাময় করে–এটি এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। নানা গবেষণা আর চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতামতের ভিত্তিতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে বলেই মেডিকেল সায়েন্সের প্রধান প্রধান বই ও জার্নালগুলোতে এ কথাগুলো ছাপা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে আপনি যদি ভালো থাকতে পারেন তবে কেন অনর্থক কাটাছেঁড়া করবেন?

প্রযুক্তির ক্রমউৎকর্ষের ফলে শহরে কিংবা গ্রামে কোথাও আমরা এখন আর হাঁটি না, সর্বত্রই গাড়িতে চলাচল করি। অর্থাৎ আমাদের জীবনযাত্রা হয়ে পড়েছে শারীরিক পরিশ্রমহীন। আমাদের খাদ্যাভ্যাসেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। শাক-সব্জির বদলে এখন আমরা ফাস্টফুড, ভাজাপোড়া ও অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এসব খাবার যতই সুস্বাদু হোক এগুলো কিন্তু শরীরের জন্যে বিপজ্জনক। আর ধূমপানের কথা তো বলাই বাহুল্য। সিগারেটের নিকোটিন হৃৎপিণ্ডের ধমনীকে সংকুচিত করে। ফলে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়, যা করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়াও যুক্ত হয়েছে আধুনিক জীবনের নানা দুশ্চিন্তা ও টেনশন।

তাই আপনার হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে ধূমপান বর্জন করুন, জীবন-অভ্যাসে পরিবর্তন আনুন এবং মনে প্রশান্তি সৃষ্টি করুন। আপনি ভালো থাকবেন। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমেরিকায় ডা. ডিন অরনিশ শত শত হৃদরোগীকে এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস ছাড়াই সুস্থ করে তুলেছেন। হৃদরোগের এ অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্যে তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা উচিত বলে আমি মনে করি। সমস্ত মেডিকেল জার্নাল, গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এর ভিত্তি আছে, এতে মিথ্যা কিছু নেই। চিকিৎসক-জীবনে আমি নিজেও এর বহু প্রমাণ পেয়েছি।

নজরুলের একটি কবিতায় আছে, 'বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেও না তাহার কাছে'। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বাস এবং আশাকে সঙ্গী করে রাখবেন। এই আশা এবং বিশ্বাসই আপনাকে সুস্থ করে তুলবে, সাফল্য এনে দেবে। এর পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তা যা দিয়েছেন তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন অর্থাৎ সবসময় কৃতজ্ঞচিত্ত থাকুন।

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার চর্চা করে যারা সুস্থ হয়েছেন তাদের সুস্থতার মূলেও রয়েছে এই বিশ্বাস। বিশ্বাস করে এগিয়ে গেছেন বলেই তারা আজ সুস্থ, হৃদরোগমুক্ত। নিঃসন্দেহে তারা ভাগ্যবান। তাদেরকে বলি– আপনারা এ অভিজ্ঞতা সবাইকে জানান, পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করুন। আপনাদের জন্যে কিংবা পত্রিকার জন্যে নয়, মানুষের জন্যে। যারা হৃদরোগ থেকে মুক্তি চান, পরিত্রাণ চান, অপারেশনের ঝুঁকি থেকে দূরে থাকতে চান, বাঁচতে চান তাদের জন্যে প্রচার করুন। সমাজের জন্যে, জাতির জন্যে সর্বোপরি মানুষের কল্যাণার্থে এ সুসংবাদ সবার কাছে পৌঁছে দেয়া একটি নৈতিক কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

আমি বিশ্বাসের সাথে যে কথাগুলো বললাম তাতে আমার পেশার কোনো ক্ষতি হবে না। আমার পেশা তার যোগ্য সম্মান নিয়েই বেঁচে থাকবে। প্রায় ২০ বছর আগে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের শিথিলায়ন ক্যাসেটের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম। সেদিনও 'প্রশান্তিতে মুক্তি' শীর্ষক ভাষণে একজন চিকিৎসক হিসেবেই আমি বলেছিলাম–'শুধু ট্যাবলেট, মিকশ্চার বা প্রেসক্রিপশন দিয়ে সব রোগমুক্তি সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক চিকিৎসককেই তার পেশাগত জীবনে এমন কিছু রোগীর সংস্পর্শে আসতে হয় যাদের রোগের সাথে কোনো না কোনোভাবে টেনশন জড়িত। দেখা গেছে, হাসপাতালের বহির্বিভাগে যে রোগীরা যান তাদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগেরই কোনো ওষুধের প্রয়োজন হয় না। কাউন্সেলিং বা সৎ পরামর্শ, আত্মবিশ্বাস এবং প্রশান্তিতে এ সমস্ত রোগের মুক্তি হয়। আর অস্থির-অশান্ত আধুনিক মানুষের জীবনে প্রশান্তির সুবাতাস আনতে পারে মেডিটেশন। কোয়ান্টাম মেডিটেশন মানুষের মনে প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে রোগ নিরাময়কে ফলপ্রসূ করে, যা এখন পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। তাই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে কোয়ান্টাম মেথড চমৎকার কাজ করতে পারে। যেসব রোগে ওষুধের প্রয়োজন নেই তার নিরাময়ে কোয়ান্টামই হতে পারে সার্থক বিকল্প।'

আসলে শরীরের চেয়ে মন অনেক বেশি শক্তিশালী। মনের গতি, শক্তি,

পরিধি সবই ব্যাপক। মনের এই দুর্দমনীয় শক্তির প্রভাবে শরীরে এমন কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, এমনকি রোগ নির্মূলেও সাহায্য করে।

যুগে যুগে মহামানবরা, নবী-রসুলরা বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ধ্যানের এ শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। এটি তাই নতুন কিছু নয়। এটি হাজার বছরের শাশ্বত চেতনারই একটি আধুনিক ও সমন্বিত রূপ, যার উৎস এই প্রাচ্য। বর্তমানে হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের এ প্রক্রিয়া সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনস্বীকৃত। তাই আমি আশা করবো, হৃদরোগ নিরাময়ের এ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

পরিশেষে এটাই বলি, আপনার সুস্থতা ও নিরাময়ের দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। তাই সুস্থ হৃদযন্ত্র সর্বোপরি সুস্থ জীবনের জন্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করুন। অর্থাৎ ইতিবাচক ও কৃতজ্ঞচিত্ত হোন। প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। নিয়মিত হাঁটুন, ব্যায়াম করুন এবং টেনশনমুক্ত জীবনযাপন করুন। সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বাস এবং আশা নাই যার, তার কাছ থেকে দূরে থাকুন। সবসময় আশাবাদী, বিশ্বাসী ও ভালো মানুষদের সংস্পর্শে থাকুন। আপনি ভালো থাকবেন।

বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার পথিকৃৎ ও শিশুবন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব আয়োজিত হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে তিনি এ বক্তব্য দেন।

জীবনযাপনে সচেতন হোন ॥ আপনার হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকবে

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান

আমরা প্রত্যেকে সুস্থ থাকতে চাই। সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে চাই। আর সুস্থতার জন্যে যেটি সবচেয়ে বেশি দরকার, সেটি হলো নিজের উদ্যোগ। অর্থাৎ আমাকে চাইতে হবে যে, আমি সুস্থ থাকবো এবং সুস্থতার জন্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলো আমি মেনে চলবো, যথাযথভাবে অনুসরণ করবো। সেইসাথে যা যা বর্জন করা উচিত তা-ও আমি অবশ্যই বর্জন করবো। একটি আনন্দময় সুস্থ জীবন উপভোগের জন্যেই আমাকে তা পারতে হবে।

অনেকে বলেন, ধূমপান ছাড়বো কীভাবে? আমি বলি, ধূমপান যদি ছাড়তে চান তবে আপনার নিজের ইচ্ছাটাই যথেষ্ট যে, আমি আর কখনো ধূমপান করবো না। এভাবে সব ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে মানুষ নিজেকে নিরাময় ও সুস্থতার পথে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা অধিকাংশ মানুষ আজ ভুল খাদ্যাভ্যাসের দিকে ঝুঁকে পড়ছি। স্বাস্থ্যঘাতী নানারকম খাবার এখন একটু একটু করে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে ঠাঁই করে নিয়েছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এখন বিভিন্ন ধরনের বোতলজাত জুস, সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস-এর প্রতি মাত্রাতিরিক্তভাবে আসক্ত। অথচ আপনার শরীরের

জন্যে, বিশেষ করে কিডনির সুস্থতার জন্যে দরকার হলো পানি। অন্যদিকে এসব ড্রিংকস ও জুস শিশুসহ যেকোনো বয়সের মানুষের কিডনির ক্ষতির কারণ। সুস্থ থাকতে চাইলে সবারই এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে নিরাময় ও সুস্থতার এক সহজাত শক্তি। ডা. হার্বার্ট বেনসন বলেছেন, 'একজন মানুষ রিলাক্সেশন, মেডিটেশন, ব্যায়াম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন'। এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তই আমরা দেখছি কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে এখানে সুস্থতার জন্যে সঠিক জীবনাচারে মানুষকে ভালোভাবে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। নিয়মিত কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। নিজেদের জীবনে যারা এসব আন্তরিকভাবে অনুসরণ করছেন তারা উপকৃত হচ্ছেন, সুস্থ আছেন, ভালো আছেন।

অনেক হৃদরোগী আছেন, যাদের হয়তো একবার এনজিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস অপারেশন করা হয়েছে; কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল, আবার বুকে ব্যথা, নতুন ব্লকেজ ইত্যাদি। তিনি আবারও অসুস্থ হতে শুরু করলেন। অর্থাৎ চিকিৎসা নেয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বার বার একই ঘটনা ঘটে চলেছে। এ দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ একটাই–আপনার জীবনযাপনের প্রতি মনোযোগী হোন। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। ব্যায়াম করুন। এবং অবশ্যই মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকুন।

করোনারি হৃদরোগের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই টেনশন। টেনশন যে শুধু হৃৎপিণ্ডেরই ক্ষতি করে তা নয়; বরং আমাদের সার্বিক সুস্থতার পথেও এটি একটি প্রধান বাধা। তাই সুস্থ থাকতে হলে প্রথম কথা হলো, আপনাকে টেনশনমুক্ত হতে হবে। মানসিক চাপ কমাতে হবে। টেনশনমুক্ত থাকার কথা উঠলেই কেউ কেউ বলেন, শিশু এবং পাগল ছাড়া বাকি সবাই নাকি টেনশনে ভোগে। আমি তখন তাদেরকে রসুলুল্লাহর (স) জীবনের কথা বলি। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং এর প্রেক্ষিতে তাঁর প্রশান্তচিত্ততা, স্রষ্টায় বিশ্বাস ও ধৈর্যের দিকে তাকাতে বলি।

টেনশনের মতো আপনার হৃৎপিণ্ডের আরেক শত্রু হলো আপনার রাগ। রাগ-ক্রোধ আপনাকে নানাভাবে অশান্ত করে তোলে, আপনার মধ্যে স্ট্রেস তৈরি করে, আপনাকে কুরে কুরে খায়। তাই এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া অর্থাৎ রাগ বর্জন খুব জরুরি। 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'–কোয়ান্টামের এই কথাটি ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব পছন্দ করি এবং সবাইকে বলি।

একেকজন একেকভাবে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণের কৌশল খুঁজে নিতে পারেন। যেমন, রাশিয়ার সাবেক রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিন। ভীষণ কঠিন প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। লৌহমানব বলা হতো তাকে। কিন্তু রেগে গেলে তিনি চুপ করে যেতেন, কোনো কথা বলতেন না। আমরাও এ বিষয়গুলো নিজেদের মতো করে অনুসরণ করতে পারি। এক্ষেত্রে আমি নিজে কিছু টেকনিক অবলম্বন করি। যেমন, রাগ আসতে শুরু করলে আমি ভাষা বদলে ফেলি, হিন্দিতে কথা বলতে শুরু করি। যে মানুষটির কথায় বা আচরণে আমার রাগ হতে চাচ্ছিলো, তিনি তখন একটু বিস্মিত হন এবং সে বিষয়ে আর কথা বাড়ান না, থেমে যান। আমিও তখন নিজেকে সহজেই সামলে নিতে পারি।

কেউ কেউ বলেন, এডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনা করতে গেলে এক-আধটু রেগে যেতে হয়। কিন্তু সত্য হলো, এডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনার জন্যে দরকার ঠান্ডা মাথায় সুচিন্তিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া ও কাজ করা। কিন্তু রেগে গেলে তো আপনি সেটি কখনোই পারবেন না। কারণ, রেগে গেলে সে মুহূর্তে মানুষের বোধ আর হিতাহিত জ্ঞান কাজ করে না। তখন ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে আরো বেশি।

জীবনে চলার পথে আরো একটি বিষয় আমাদের অসুস্থ করে তোলে; সেটি হলো নেতিবাচকতা–নেতিবাচক কথা, চিন্তা বা কাজ। কাজ শুরু করার আগে শুধু নেতিবাচক চিন্তা করে আর অকারণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগে আমরা অনেক সময় ব্যয় করে ফেলি–এটা করলে কী হবে, কে কী বলবে ইত্যাদি। কিন্তু আসল কথা হলো, আপনি যদি মনে করেন কাজটা ভালো, তবে সেটি শুরু করে দেয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যে সকল ধরনের নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। আপনি চেষ্টা করুন, ভালো ও সৎ নিয়তে কাজ করুন, আল্লাহ সাহায্য করবেন। আর কাজ করতে গিয়ে আমরা যেন নাম যশ খ্যাতি প্রশংসার আসক্তিতে আক্রান্ত না হই। কারণ এ আসক্তিও আমাদের অনেক অশান্তি আর অসুস্থতার জন্যে দায়ী।

প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় নিত্যনতুন অনেক ওষুধ আবিষ্কৃত হচ্ছে সত্যি, কিন্তু জীবনের এ দিকগুলোর প্রতি কোনোরকম মনোযোগ দেয়ার সুযোগ সেখানে নেই। আমার খুব ভালো লাগে যে, কোয়ান্টাম এ বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরছে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে আমি দেখেছি, অসংখ্য মানুষ এখানে এসে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাপনের প্রতি সচেতন হয়ে উঠছেন। সমস্ত নেতিবাচকতার বৃত্ত ভেঙে তারা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও

আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠছেন। যিনি এসেছিলেন রোগ শোক জরা ব্যাধি অস্থিরতা দুঃখ নিয়ে–মনের ও বিশ্বাসের শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে তিনি সুস্থতার পথে এগিয়ে যেতে পারছেন। কারণ, যেকোনো রোগমুক্তি এবং সর্বোপরি পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে মানসিক চাপমুক্তি ও প্রশান্তিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। সে অর্থে, কোয়ান্টাম সত্যিই মানুষকে সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন ও কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের আলোকিত পথে পরিচালিত করছে।

বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর মহাসচিব জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক। ১৯ অক্টোবর, ২০১২ কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব আয়োজিত হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এ বক্তব্য দেন।

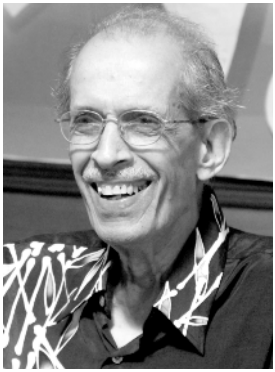

সুস্থ জীবনধারা, প্রার্থনা ও মেডিটেশন ॥ হৃদরোগ নিরাময় করে

জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব.) ডা. আব্দুল মালিক

মানুষ সৃষ্টির সেরা। মানুষের জন্মরহস্য বেশ সূক্ষ্ম আর জটিল। মায়ের গর্ভে যে ভ্রূণ থাকে, তা প্রথমে থাকে একটি কোষ, তারপর সেটি বিভক্ত হয়ে একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, এভাবে কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে ওঠে। হৃৎপিণ্ড গড়ে ওঠে গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে। একসময় পূর্ণাঙ্গ মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয়। সে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে।

মানবদেহ এবং এর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেবল কিছু বস্তু নয়, শরীরের প্রত্যেক কোষেই রয়েছে একটি চেতনা এবং প্রতিনিয়ত এতে ভাঙা-গড়া চলছে। আর এভাবেই হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, কিডনি, লিভার প্রত্যেকেই সুশৃঙ্খল ও সমন্বিতভাবে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্য দিয়ে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। সে কারণেই সম্ভব হচ্ছে আমাদের সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা।

বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে সংক্রামক ব্যাধির পরিমাণ কমে যাওয়ার সাথে সাথে অসংক্রামক ব্যাধি, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার মারাত্মক স্বাস্থ্য-সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে

শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগ মৃত্যুর কারণ হলো এসব অসংক্রামক ব্যাধি, যার অন্যতম হচ্ছে করোনারি হৃদরোগ এবং এটি শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ মৃত্যুর কারণ। গত ২০ বছরে বাংলাদেশে হৃদরোগে মৃত্যুর হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শতকরা ২০-২৫ জন উচ্চ রক্তচাপে এবং শতকরা ১০ জন করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন।

মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যে অঙ্গটি নিরলস কাজ করে আমাদের কর্মক্ষম রাখে সেটি হলো আমাদের হৃৎপিণ্ড। আমরা জানি, রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষে পৌঁছে যায়। আর হৃৎপিণ্ডে এটি পৌঁছে দেয় করোনারি আর্টারি।

আমরা যখন ক্রমাগত ভুল খাদ্যাভ্যাস ও ভ্রান্ত জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তখন এই করোনারি আর্টারিতে কোলেস্টেরল জমে জমে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হয়। একসময় বুকে ব্যথা অনুভূত হয়, যাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয় এনজাইনা। এরই পরিণতিতে একসময় দেখা দিতে পারে হার্ট অ্যাটাক (Myocardial Infarction)।

ছোটবেলা থেকেই রক্তনালীতে কোলেস্টেরল জমা শুরু হয় এবং একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর উপসর্গ দেখা দেয়। করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকিপূর্ণ কারণগুলো হলো–ধূমপান, ভুল খাদ্যাভ্যাস, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য, অতিরিক্ত ওজন, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং মানসিক চাপ ইত্যাদি।

বিশ্বজুড়ে বর্তমানে হৃদরোগ এবং স্ট্রোক অন্যতম ঘাতক ব্যাধি এবং অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী। বিশ্বে প্রতিবছর এক কোটি ৭৫ লাখ মানুষ এ রোগে মারা যায় এবং এ সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে দুই কোটি ৩০ লাখ মৃত্যু ঘটবে শুধু হৃদরোগেই। এটি সত্যিই খুব দুঃখজনক। কারণ, হৃদরোগসহ এ ধরনের ভুল জীবনাচারজনিত অসুখে মানুষ যখন ভুগতে শুরু করে ও মারা যায়, সেই সময়টি হলো জীবনের সুন্দরতম একটি সময়, যখন তারা নিজেদের পরিবার, সমাজ এবং জাতির জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখতে পারতেন।

করোনারি হৃদরোগ একবার হয়ে গেলে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। এজন্যে প্রথম থেকেই এর প্রতিরোধের দিকে জোর দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ডা. ডিন অরনিশ প্রমাণ

করেছেন যে, সুস্থ জীবনযাপন, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস, কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম, মেডিটেশন বা ধ্যানের মাধ্যমে অনেক হৃদরোগী অপারেশন ও এনজিওপ্লাস্টি ছাড়াই সুস্থ হয়েছেন। আর আমাদের মনে রাখা উচিত, অপারেশন ও এনজিওপ্লাস্টি কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। সুস্থ থাকতে চাইলে সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই। তা না হলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

নিরাময়ের এক অসাধারণ ক্ষমতা দিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর মানুষ শুধু একটি দেহ নয়, দেহ এবং আত্মা–এ দুয়ের সমন্বয়ে একজন মানুষ। পরিপূর্ণ সুস্বাস্থ্যের জন্যে তাই দেহ ও মন উভয়ের সুস্থতা জরুরি। আমাদের দেহ বস্তু জগতের, এটি স্থান-কালে সীমাবদ্ধ। আর আত্মা অপার্থিব জগতের, যা মুক্ত, বন্ধনহীন এবং স্থান-কালে সীমাবদ্ধ নয়। এই আত্মা ভালো থাকলে মানুষের শরীরও ভালো থাকে। তাই প্রয়োজন স্রষ্টার প্রতি মানুষের পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস, প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এবং সবসময় সৎকর্ম করা।

জীবনে সুখ-শান্তি চাইলে এটি অর্জনের উপায়ও জানতে হবে। শুধু পার্থিব সম্পদ মানুষকে সুখ-শান্তি দিতে পারে না। সুখী হতে হলে শরীর এবং আত্মাকেও সুস্থ রাখতে হবে। আর শারীরিক সুস্থতার জন্যে সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। আত্মার সুস্থতার জন্যে স্রষ্টায় বিশ্বাসের পাশাপাশি পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হতে হবে। ধর্মের মূল শিক্ষার অনুশীলন, নিয়মিত প্রার্থনা ও মেডিটেশন করলে আত্মায় প্রশান্তি আসে। আর এটি রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে চমৎকার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

মানুষের মন তার অতীতের সুখ-দুঃখ কিংবা ভবিষ্যতের চিন্তা-আশঙ্কা নিয়ে সবসময় অস্থির থাকে। এই অস্থির মনকে স্থিরতা, শান্তি ও কল্যাণের পথে আনতে হলে মেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। চঞ্চল মনকে শান্ত ও সংযত করে তুলতে পারলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণকারী মহাচেতনার সাথে যোগাযোগ সম্ভব। সত্যে পৌঁছার জন্যেও তাই মনকে শান্ত করা চাই। এজন্যেই মেডিটেশন।

মেডিটেশন আমাদের মনকে শান্ত করে, বর্তমানে নিয়ে আসে, নিজের প্রতি মনোযোগ দিতে শেখায়। টেনশন ও চাপমুক্তি তখন সহজ হয়। এর পাশাপাশি জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ এবং জীবনধারা পরিবর্তন করাও অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সময়ে যত রোগ হচ্ছে, তার একটা

বড় অংশের কারণ হলো মানুষের ভুল জীবনযাপন। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব এ বিষয়গুলোর প্রতি মানুষকে সচেতন করে তুলছে, একটি সময়োপযোগী উদ্যোগের মাধ্যমে হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে কাজ করে যাচ্ছে। সেজন্যে আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক-এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবনের কিছু কথা' থেকে–

হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রেখে সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের জন্যে করণীয় :

- ☐ *ধূমপান বর্জন করুন*
- ☐ *সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন*
- ☐ *তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন*
- ☐ *ফলমূল ও শাক-সব্জি বেশি খান*
- ☐ *লবণ ও চিনি কম খান*
- ☐ *শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন*
- ☐ *নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করুন*
- ☐ *বেশি বেশি হাঁটার অভ্যাস করুন*
- ☐ *উচ্চ রক্তচাপ ও বহুমূত্র নিয়ন্ত্রণে রাখুন*
- ☐ *বাচ্চাদের গলাব্যথা ও বাতজ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন*
- ☐ *বয়স ৪০ বা তার বেশি হলে প্রতি ৬ মাসে ১ বার রক্তে চর্বির পরিমাণ পরীক্ষা করুন*
- ☐ *যাদের পরিবারে হৃদরোগের ইতিহাস রয়েছে, তারা বেশি সাবধানতা অবলম্বন করুন*
- ☐ *মনের প্রভাব শরীরের ওপর পড়ে। কাজেই আমাদের যতদূর সম্ভব দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা উচিত। এজন্যে নিয়মিত নামাজ, প্রার্থনা, মেডিটেশন, শিথিলায়ন করুন*

বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশন এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর চীফ কনসালটেন্ট ডা. হাসনাইন নান্না। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব আয়োজিত হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে তিনি এ বক্তব্য দেন।

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস ॥ হৃদরোগ নিরাময়ে স্থায়ী সমাধান নয়

ডা. হাসনাইন নান্না

একজন হৃদরোগ-চিকিৎসক হিসেবে আমাকে প্রতিদিন কিছু রুটিন কাজের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যেমন, রোগী দেখা, প্রয়োজনে তাদের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো, কখনো-বা এনজিওগ্রাম করা এবং রোগীর ব্লকেজের পরিমাণ অনুসারে স্টেন্ট বা রিং লাগানো। আর ব্লকেজের পরিমাণ অনেক বেশি হলে তাকে বাইপাস অপারেশনের পরামর্শ দেয়া।

একটা গান আছে, 'বলতে হলে নতুন কথা, চেনা পথের বাইরে চল'। আজ আমি আমার প্রতিদিনকার এই চেনা পথের বাইরের কিছু কথাই আপনাদের বলবো। তার আগে আমার চেনা পথের দুটি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা শোনাই।

২০০৮ সালের কথা সেটা। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে ভর্তি হয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। আনুষঙ্গিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তাকে বললাম, মনে হচ্ছে আপনার হার্টে ব্লকেজ থাকতে পারে। এনজিওগ্রাম করে নিলে ব্যাপারটা নিশ্চিত করে বলা যাবে।

তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এমনিতে বেশ হাসিখুশি মানুষ। এবং খুব সাহসী। বললেন, কুচ পরোয়া নেহি। এনজিওগ্রাম করে ফেলুন। আমরা এনজিওগ্রাম করলাম। দেখা গেল, ব্লকেজের পরিমাণ এমন যে, তাতে স্টেন্ট লাগিয়ে কাজ হবে না। বাইপাস অপারেশন করাতে হবে। বিষয়টা শুনে তিনি প্রথমে কিছুটা দমে গেলেও, পরে বাইপাস করাতে রাজি হলেন। বাইপাস করা হলো। একমাসের মাথায় মোটামুটি সুস্থ হয়ে তিনি তার ব্যস্ত জীবনে ফিরে গেলেন।

ছমাস পর একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ আবার তার ফোন। বললেন, খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এখন কী করণীয়? একটা এম্বুলেন্স নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চলে আসতে বললাম। স্যার এলেন। ভর্তি করা হলো তাকে। প্রথমবার অসুস্থ হয়ে যখন এসেছিলেন, তখন বাইপাস করানোসহ সবমিলিয়ে হাসপাতালে ছিলেন একমাস। এবার তাকে থাকতে হলো বেশ অনেকদিন। অস্বাভাবিক রকমের একটা লম্বা সময় তিনি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কাটালেন। প্রায় চার মাস লাগলো তার সেরে উঠতে।

এ ঘটনার প্রায় বছর তিনেক পর এই কিছুদিন আগে একটা ব্যক্তিগত কাজে তাকে ফোন করলাম। জানতে চাইলাম, স্যার কেমন আছেন? তার খুব সহজ স্বীকারোক্তি–'আমি ভালো নেই'। কেন স্যার, কী হলো? তিনি বললেন, 'আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে, মাত্র গতকালই হাসপাতাল থেকে ফিরেছি। এবার একমাস হাসপাতালে ছিলাম। আবার এনজিওগ্রাম করা হয়েছে। বাইপাস আর্টারিতে নতুন ব্লক। এখন যে কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না'।

আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটা যাকে নিয়ে, তিনি আমার এক ডাক্তার বড় ভাই। বহুদিন দেশের বাইরে ছিলেন। দেশে ফিরলেন ১৯৯০ সালে। রাজশাহীতে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। ছাত্রজীবনে রাজনীতি করতেন, খুব ভালো বক্তা ছিলেন। দেশে ফিরেও প্র্যাকটিসের পাশাপাশি রাজনীতিতে সক্রিয় হলেন আবার।

হঠাৎ একদিন তার ফোন। তিনি ঢাকায় আসবেন, ডাক্তার দেখাতে হবে। দিন কয়েক আগে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ গিয়েছিলেন একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের অতিথি হয়ে। বক্তৃতা শুরুর আগে হঠাৎ তার ভীষণ বুকব্যথা। সাথে দরদর করে ঘাম। বক্তৃতা আর দেয়া হয় নি। তিনি ঢাকায় এলেন। এনজিওগ্রাম করা হলো। হার্টের বামদিকের রক্তনালী পুরোপুরি বন্ধ। হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্লক। রিং পরানো হলো। তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। আবার শুরু করলেন রাজনীতি। সাথে নিয়মিত প্র্যাকটিস।

দুবছরের মাথায় হঠাৎ একদিন তার ফোন। আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঢাকায় এলেন। এবার করা হলো সিটি এনজিওগ্রাম। তাতে দেখা গেল, আগে যেখানটায় রিং পরানো হয়েছিলো তার পাশে আরেকটি ব্লকেজ। সব শুনে তার মন খুব খারাপ। বললেন, দেশে আর নয়। চলে গেলেন দিল্লি। ওখানে আবার এনজিওগ্রাম করা হলো। তাতেও একই রিপোর্ট। অগত্যা আরেকটি রিং পরিয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন।

এখানেই শেষ নয়, এক বছরের মাথায় আবার বুকব্যথা। আবার দিল্লি। আবার এনজিওগ্রাম। এবার আরো দুঃসংবাদ। দ্বিতীয়বার যে রিংটি লাগানো হয়েছিলো সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। সাথে অন্যান্য রক্তনালীতেও নতুন ব্লকেজ। ফুসফুসেও কিছু সমস্যা দেখা গেছে। তাকে বলা হলো, বিশেষ ধরনের একটা বাইপাস অপারেশন আছে, আপনি সেটা করাতে পারেন। সেটি হলো, রোবটিক সার্জারি।

রোবটিক সার্জারি করেন যিনি, সেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া হলো। ১৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। যা-ই হোক, সেবার কিছু না করে তিনি দেশে চলে এলেন। কিছুদিন আগেও যে মানুষটি নিয়মিত প্র্যাকটিস করতেন, রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, এবার তিনি হয়ে গেলেন পুরোপুরি গৃহবন্দী। প্র্যাকটিস, রাজনীতি সব বন্ধ। এখন সারাদিন ইন্টারনেটের সামনে বসে সার্চ করতে থাকেন রোবটিক সার্জারি কোথায় হয়, কেমন করে হয়, কত টাকা খরচ ইত্যাদি।

এই যে দুটি অভিজ্ঞতা আমার, এমন ঘটনার সংখ্যা কিন্তু খুব একটা কম নয়। এ দুজন হৃদরোগী আধুনিকতম চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, সেটা কোনো স্থায়ী সমাধান ছিলো না। তাদের দুজনেরই অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, কিন্তু এখন কোনো উপায় নেই। হৃদরোগীদের অনেকেই আছেন, যাদের কাছে এসব অভিজ্ঞতা নতুন নয়।

করোনারি হৃদরোগ সম্পর্কে এখন আমরা কমবেশি জানি। হার্টের করোনারি আর্টারিতে কোলেস্টেরল জমে জমে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে হার্ট বঞ্চিত হয় তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং পুষ্টি থেকে। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয় বুকে ব্যথা ও চাপ, শ্বাসকষ্টসহ আরো নানা উপসর্গ। আমরা যদি দেখি, এ রোগ কেন হয়? ধূমপান, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস, বিজ্ঞাপন-নির্ভর ভুল খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম না করা, মানসিক চাপ এবং টেনশন করোনারি হৃদরোগের প্রধান কারণ।

কেউ একজন যখন আমাদের কাছে এসে বলেন, একটু হাঁটলে বা পরিশ্রম

করলে কিংবা সিঁড়ি বেয়ে উঠলে তার বুক ব্যথা হচ্ছে, তিনি বুকে চাপ অনুভব করছেন, এই ব্যথা আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে দাঁতের গোড়া অবধি বা পিঠে, বাম হাতে যাচ্ছে, তখন প্রাথমিকভাবে আমরা এগুলোকে করোনারি হৃদরোগের উপসর্গ বলেই ধরে নিই।

করোনারি হৃদরোগের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে রোগীকে আমরা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরামর্শ দিয়ে থাকি। এর মধ্যে প্রথমেই আসে ইসিজি'র কথা। অনেকেরই ধারণা, ইসিজি স্বাভাবিক তো সবই ঠিক, হৃদরোগ নেই। আমিও একসময় তা-ই মনে করতাম। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে ঠিক তা নয়। আমার নিজের এই ভুল ভাঙালো একজন রোগীর এটেনডেন্ট। আমরা ডাক্তাররা বই পড়ে যা শিখি, কখনো কখনো তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখি রোগী এবং রোগীর এটেনডেন্টের কথা শুনে।

২০০০ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। আমি তখন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে কার্ডিওলজিতে এমডি করছি। একদিন সিসিইউতে ডিউটি করছি। এক রোগীর এটেনডেন্ট এসে বললেন, ডাক্তার সাহেব, আমার রোগীটা জরুরি বিভাগে আছে, এই তার ইসিজি, একটু দেখে দিন। দেখলাম। বললাম, আপনার রোগীর ইসিজি তো নরমাল, রোগী ভালো আছে। তখন তিনি বললেন, এটাই তো আমার রোগীর সমস্যা। রোগীর ইসিজি সবসময় স্বাভাবিকই থাকে, কিন্তু বুকের ব্যথা কমছে না এবং ডাক্তাররা বলেছেন, এটা হার্টের অসুখ, হার্টে ব্লক আছে।

সেদিন খুব অবাক হয়েছিলাম; পরে অবশ্য আমার শিক্ষকদের কাছে জেনেছি, ভালো কার্ডিওলজিস্ট হতে হলে ইসিজিকে অবিশ্বাস করতে হবে। কারণ, শুধুমাত্র ৪৮ ভাগ হার্ট অ্যাটাক বোঝা যায় ইসিজি দেখে, বাকি ৫২ ভাগ বুঝতে হয় রোগীর উপসর্গ শুনে, আর এ শোনাটা ফলপ্রসূ হয় কেবল তখনই, যখন রোগীর কথা মনোযোগ দিয়ে এবং মমতা দিয়ে শোনা হয়। তাই চিকিৎসকের কাছে গেলে আগে আপনার শারীরিক অসুবিধাগুলো তাকে বলুন, রোগের উপসর্গগুলো বিস্তারিত বলুন। কেউ বলতে পারেন যে, ডাক্তার সাহেব কথা শোনেন না, শুনতে চান না। অভিযোগটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সত্যি। কিন্তু রোগীদের আমি বলি, এর সমাধান খুব সহজ। আপনার কথা যিনি শুনবেন সেই ডাক্তারের কাছে যান। খুঁজে বের করুন।

উপসর্গ বিবেচনার পাশাপাশি ইসিজি ছাড়াও করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের জন্যে আছে আরো কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যেমন : ইটিটি, ইকোকার্ডিওগ্রাম এবং করোনারি এনজিওগ্রাম। এগুলোর ফলাফল অনুসারে কার্ডিওলজিস্টরা

রোগীকে এনজিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস অপারেশনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সাথে সারাজীবন ওষুধ সেবনের নির্দেশনা তো আছেই।

বাইপাস অপারেশন নিয়েও আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে। সেটিও আমি যখন হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে কাজ করছিলাম, সেই সময়কার ঘটনা। একজন রোগী এলেন। তার সব কাগজপত্র আর রিপোর্ট দেখে জানলাম, এনজিওগ্রাম করা হয়েছে এবং হার্টের তিনটা আর্টারিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্লক। তিনটা রক্তনালী পুরোপুরি বন্ধ। লোকটা তাহলে বেঁচে আছে কীভাবে? রোগীর এটেনডেন্ট বললেন, ডাক্তার তাদের বলেছেন যে, রোগীর তিনটা আর্টারিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্লক আছে সত্যি কিন্তু রিং লাগানো বা বাইপাস কিছুই প্রয়োজন নেই; আল্লাহর রহমতে তার অটো-বাইপাস হয়ে গেছে (চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, ন্যাচারাল বাইপাস)। আমার সত্যিকারের শেখা শুরু হলো।

পরে জেনেছি, এই ন্যাচারাল বাইপাস ঘটে মূলত কোলেটারাল সারকুলেশনের মাধ্যমে। আমাদের হার্টের চারপাশে বেশকিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালী রয়েছে। নিয়মিত হাঁটা এবং ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে এই পরিপূরক রক্তনালীগুলো সক্রিয় ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। হার্টের মূল রক্তনালীগুলোতে ব্লকেজের কারণে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে এই পরিপূরক রক্তনালীগুলো তখন প্রয়োজনীয় কাজটুকু চালিয়ে নেয়। মূলত এটাই ন্যাচারাল বাইপাস।

আসলে হৃদরোগ থেকে নিরাময় ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্যে নিয়মিত হাঁটা, ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান বর্জন আর টেনশনমুক্ত থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসাগুলো রোগীদের জীবনে কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারছে না। রোগী যে চিকিৎসাই নিচ্ছেন, কিছুদিন পরই ঘুরে-ফিরে আবার সেই একই সমস্যা। আমার পরিচিত এরকম দুজন রোগীর কথা আমি প্রথমেই বলেছি। আবার অন্যদিকে যারা জীবনের ভুল অভ্যাসগুলো পাল্টে ফেলেছেন তারা সত্যিই ভালো আছেন, তিনি এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস করুন আর না-ই করুন। সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটেই এ কথাটি সত্যি।

সন্দেহ নেই, আমেরিকার চিকিৎসাব্যবস্থা বিশ্বের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। বাইপাস অপারেশনের শুরুও ওখানেই। ১৯৬৭ সালে আমেরিকার ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকে প্রথম সফল বাইপাস সার্জারি করা হয়। সেই থেকে এখন পর্যন্ত ৪৫ বছর পেরিয়ে গেছে। বাইপাস তো হরদম হচ্ছে

দেশে-বিদেশে, কিন্তু তারপর কী অবস্থা? সবাই কি ভালো আছেন?

আমেরিকার একজন রোগীর কথাই বলি। রোগী আর কেউ নন, খোদ আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। বুকে ব্যথা হলো। হাসপাতালে ভর্তি হলেন। এনজিওগ্রাম করা হলো। আমেরিকার সেরা সেরা কার্ডিওলজিস্টদের নিয়ে মেডিকেল বোর্ড করা হলো। সিদ্ধান্ত হলো, বাইপাস করতে হবে। করা হলো বাইপাস। ক্লিনটন সুস্থ হয়ে আবার কাজকর্ম শুরু করলেন। কিছুদিন পর ব্যক্তিগত জীবনে কিছু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন। প্রেসিডেন্টশিপ চলে যাওয়ার মতো গুরুতর অবস্থা তৈরি হলো। সবমিলিয়ে ভীষণ এক স্ট্রেসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।

ঝামেলা একসময় মিটলো ঠিকই, কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। বাইপাসের ছয় বছরের মাথায় আবার বুকে ব্যথা। যথারীতি আবার এনজিওগ্রাম, আবার মেডিকেল বোর্ড। সিদ্ধান্ত হলো রিং পরানোর। রিং পরালেন। এবার জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন করার ব্যাপারে তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। তার চুরুট খাওয়ার অভ্যাস ছিলো, ত্যাগ করলেন দীর্ঘদিনের সে অভ্যাস। চর্বিযুক্ত খাবার আর ফাস্টফুড ছেড়ে দিলেন পুরোপুরি। শুরু করলেন শাক-সব্জি আর ফলমূল খাওয়া। এখন তিনি ভালো আছেন।

শুধু তা-ই নয়, বিল ক্লিনটন দ্বিতীয় মেয়াদে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে হোয়াইট হাউজে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের একজন ছিলেন ডা. ডিন অরনিশ। ক্যালিফোর্নিয়ার এই চিকিৎসাবিজ্ঞানী মেডিটেশন এবং সুস্থ জীবনযাপনের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ের পথিকৃৎ। এ থেকেই বোঝা যায়, হৃদরোগ নিরাময়ে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ জীবনাচার অনুশীলনের ব্যাপারে ক্লিনটন নিজে কতটা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

সুস্থতার জন্যে আসলে এই জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি এদিকে দৃষ্টি দেবেন, পৃথিবীর যে দেশেই যত উন্নততর চিকিৎসা আপনি নেন, সমস্যা সমস্যার জায়গাতেই থেকে যাবে। তাই হৃদরোগ থেকে নিরাময় ও সুস্থ জীবনের জন্যে স্থায়ী সমাধান যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তার চাবিকাঠি একমাত্র আপনার হাতেই, ডাক্তার আর ওষুধ আপনার সহযোগী মাত্র।

এনজিওপ্লাস্টি ও
বাইপাস সার্জারি ছাড়াই

হৃদরোগ নিরাময়
ও
প্রতিরোধ

১

হৃৎপিণ্ড পরিচিতি ॥ করোনারি হৃদরোগ ও এর কারণ

মানবদেহ স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি। মহাবিশ্বে এত চমৎকার, এত বুদ্ধিমান, এত সৃজনশীল, এত সংবেদনশীল আর কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আমাদের এ দেহেরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হচ্ছে হৃৎপিণ্ড। বুকের মাঝখানে দুই ফুসফুসের মাঝে এটি অবস্থিত।

হৃৎপিণ্ড : গঠন ও কাজ

হৃৎপিণ্ডের গঠনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এর রয়েছে চারটি প্রকোষ্ঠ। ওপরের দুটিকে বলা হয় অ্যাট্রিয়াম বা অলিন্দ এবং নিচের দুটিকে বলা হয় ভেন্ট্রিকল বা নিলয়। আর হৃৎপিণ্ড তার চারপাশে পেরিকার্ডিয়াম নামক একটি আবরণী দ্বারা পরিবেষ্টিত।

হৃৎপিণ্ডকে আমরা বলতে পারি, এটি একটি পাম্প যা একজন মানুষের জীবদ্দশায় প্রায় সাড়ে চার কোটি গ্যালনের চেয়ে বেশি রক্ত পাম্প করে থাকে। প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষবার হৃৎস্পন্দনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড দেহের প্রতিটি কোষে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও অক্সিজেন পৌঁছে দিচ্ছে। আর এটি সম্ভব হচ্ছে ধমনী শিরা উপশিরা ও ছোট ছোট রক্তনালী মিলিয়ে প্রায় ৬০ হাজার মাইল পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে।

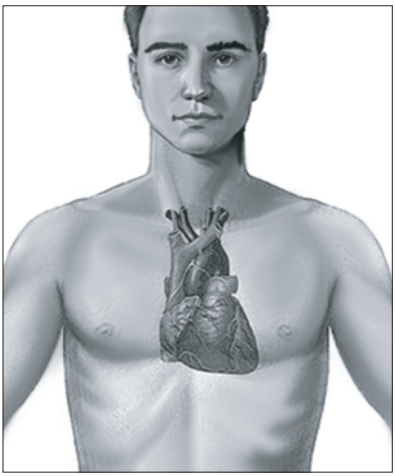

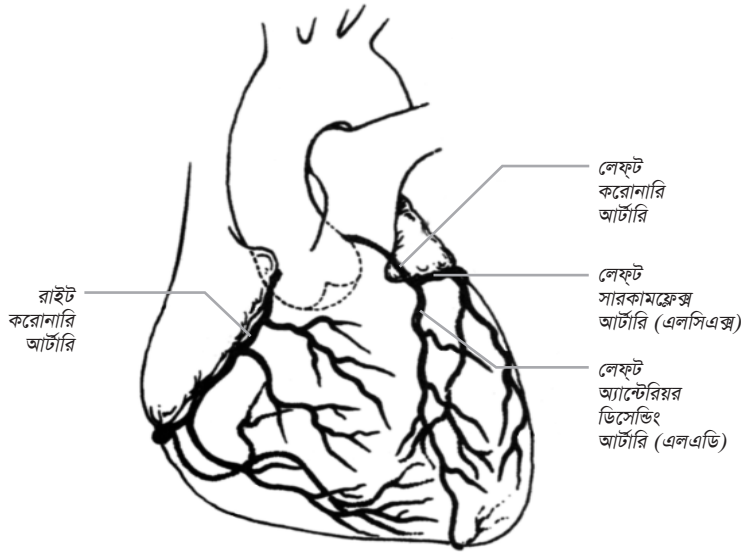

হৃৎপিণ্ড ও এর প্রধান ধমনীসমূহ

কেউ কেউ মনে করেন, হৃদয় আর হৃৎপিণ্ড একই জিনিস; কিন্তু আসলে তা নয়। হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে বলা যায়, এটি একটি মাংসপিণ্ড আর হৃদয় হচ্ছে একটি চেতনাগত অস্তিত্ব–যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না; তবে এটি আমাদের অনুভূতিতে সাড়া দেয় ও প্রভাবিত হয়।

হৃৎপিণ্ড আর হৃদয় পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং হৃদয় দ্বারা হৃৎপিণ্ড দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানবো।

আমরা জেনেছি, পাম্প করে সারা শরীরে রক্ত পাঠানোই হৃৎপিণ্ডের অন্যতম প্রধান কাজ। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, হৃৎপিণ্ডের নিজের কোষ ও পেশিগুলোর সুস্থভাবে বেঁচে থাকা এবং কর্মক্ষম থাকার জন্যেও দরকার পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পুষ্টি। এ পুষ্টি পৌঁছে দেয়ার কাজটি সাধিত হয় রক্তের মাধ্যমে।

হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে করোনারি ধমনী। হৃৎপিণ্ডের প্রধান দুটি করোনারি ধমনী হলো, যথাক্রমে বাম ও ডান করোনারি ধমনী বা লেফ্‌ট করোনারি আর্টারি ও রাইট করোনারি আর্টারি। লেফ্‌ট করোনারি আর্টারি আবার একটু নিচের দিকে এসে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে–লেফ্‌ট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারি (এলএডি) ও লেফ্‌ট সারকামফ্লেক্স আর্টারি (এলসিএক্স)।

করোনারি হৃদরোগ : জানা চাই আদ্যোপান্ত

হৃৎপিণ্ডের অনেক ধরনের রোগ হয়ে থাকে। এর মধ্যে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যে রোগটি সবচেয়ে ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটি হলো, করোনারি আর্টারি ডিজিজ (Coronary artery disease)। আর এই করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করতে হলে এ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই।

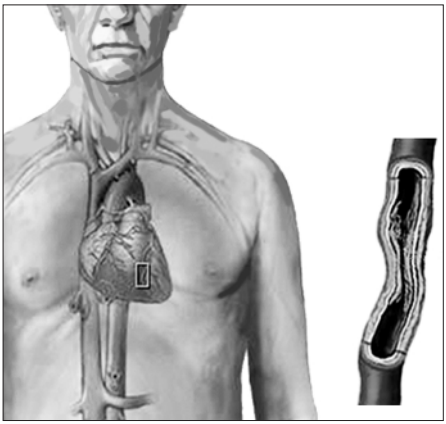

করোনারি ধমনীর ভেতরের দেয়ালে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজের সৃষ্টি হয়েছে

ক্রমাগত ভুল জীবনযাপনের ফলে করোনারি ধমনীর ভেতরের দেয়ালে কোলেস্টেরল প্লাক বা হলুদ চর্বির স্তর জমে। এতে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। যার কারণে হৃৎপিণ্ডের কোষগুলোতে রক্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছাতে পারে না। ফলে রোগী একসময় বুকে ব্যথা অনুভব করেন। রক্ত চলাচল কমে গিয়ে এ সমস্যাটি দেখা দেয় বলে একে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজও (Ischaemic heart disease) বলা হয়ে থাকে।

- বিশেষ করে কিছুদূর হাঁটলে কিংবা ভারী কাজ বা সিঁড়িতে ওঠানামার মতো পরিশ্রম করলেও বুকে ব্যথা অনুভূত হয়।
- রাতের ভারী খাবারের পর কিংবা অতিরিক্ত ঠান্ডাতেও ব্যথা হতে পারে।

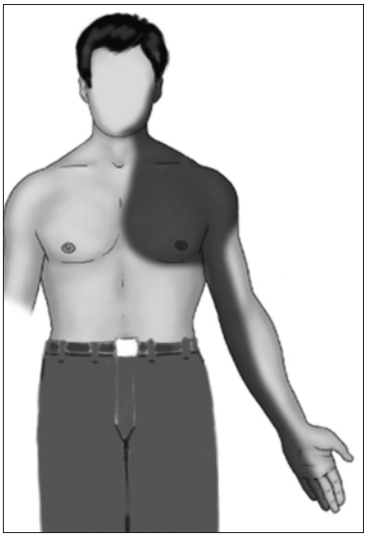

সাধারণত শরীরের এসব অংশে করোনারি হৃদরোগজনিত ব্যথা হয়ে থাকে (ছাই রঙ চিহ্নিত)

● রোগী কোনো কারণে তীব্র মানসিক চাপ বোধ করলেও এ ব্যথা শুরু হতে পারে।

● সাধারণত বিশ্রাম নিলে বা জিহ্বার নিচে নাইট্রেট জাতীয় ওষুধ নিলে ব্যথা কমে আসে।

করোনারি হৃদরোগজনিত এ ব্যথাটি চিকিৎসাশাস্ত্রে এনজাইনা (Angina) নামে পরিচিত। অধিকাংশ রোগীই এ সময় বুকের মধ্যে ভার ভার বা এক ধরনের চাপ অনুভব করেন। মূলত বুকের বাম দিকে বা বুকের মধ্যখানে এই ব্যথা অনুভূত হয়। কখনো কখনো শ্বাসকষ্টও অনুভব হতে পারে। বুকের এই ব্যথা সাধারণত ঘাড়, থুতনি, ওপরের পিঠ, বাহু, বিশেষ করে বাম হাত বা কব্জিতেও ছড়িয়ে যেতে পারে।

কখনো কখনো ওপরের পেটেও এ ব্যথা হতে পারে, যা সবচেয়ে বিপজ্জনক। কেন? আপনি হয়তো রাতে বেয়াই-বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছেন। রান্না বেশ ভালো হয়েছিলো, তৃপ্তির সাথে খেয়েছেনও তাই পেটপুরে। রাতে বাড়ি ফিরে এসে ঘুমিয়েছেন। মাঝরাতের দিকে হঠাৎ আপনার ঘুম ভেঙে গেল। বুকটা জ্বলছে। সাথে ওপরের পেটে ভীষণ একটা অস্বস্তি। স্বাভাবিকভাবেই কী মনে হবে আপনার? প্রথমেই মনে হবে এসিডিটি। রাতে গুরুপাক খাবার খেয়েছি, তাই হয়তো এসিডিটি হয়েছে। বাড়িতে এন্টাসিড থাকলে খেয়ে নিলেন একটা।

তারপরও কমছে না দেখে রেনিটিডিন বা ওমিপ্রাজল জাতীয় ওষুধও হয়তো একটা খেয়ে নিলেন। তবু কমছে না, বরং কিছুটা যেন বাড়ছে। ফোন করলেন আপনার আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয় একজন চিকিৎসককে। আপনার বর্ণনা শুনে ডাক্তারেরও হয়তো প্রথমেই মনে হবে–রাতের খাবারই এর কারণ, অতএব এটা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাই বটে।

ফলে আপনার আর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যাওয়া হলো না। একসময় সকাল হওয়ার আগেই দেখা গেল, আপনার হার্ট অ্যাটাক এবং ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কখনো কখনো হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম চিত্র এটি। অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাক হতে যাচ্ছে কিন্তু আপনি মনে করছেন এসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা।

আবার এমনও নয় যে, করোনারি হৃদরোগ হলে সবসময় আপনার ব্যথা হবে। অনেক রোগী আছেন, যাদের করোনারি ধমনীতে হয়তো ৭০/৮০/৯০ শতাংশ ব্লকেজ, কিন্তু কখনোই ব্যথা অনুভব করেন নি। তিনি হয়তো প্রথমবারের মতো ব্যথা অনুভব করেন, যেদিন তার হার্ট অ্যাটাক হয়।

এছাড়াও ডায়াবেটিস আছে যাদের, তাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই ব্যথা অনুভূত হয় না। অতএব করোনারি হৃদরোগ হলেই যে ব্যথা হবে, আবার ব্যথা নেই মানেই যে হৃদরোগ নেই–এটি সবসময় জোর দিয়ে বলা যায় না।

আবার কেউ হয়তো রাতে ঘুমিয়েছেন, আর স্বপ্ন দেখছেন–এক কোটি টাকা যে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেছিলেন, সেটা মার খেয়েছে। কিংবা ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের লোন করেছিলেন, শোধ করতে পারছেন না বলে ব্যাংক এখন কেস করে দিয়েছে। পুলিশ ধরতে আসছে, তিনি পালাচ্ছেন।

এমন দুঃস্বপ্ন দেখার সময় অর্থাৎ ঘুমের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। কিংবা তীব্র ব্যথায় ঘুম ভেঙে যেতে পারে। রাতে ঘুমের মধ্যে হয় বলে এই ব্যথার নাম নক্‌চারনাল এনজাইনা (Nocturnal angina)। কোনো কোনো হৃদরোগী আবার চিৎ হয়ে শুলেও ব্যথা অনুভব করতে পারেন। এটি ডিকুবিটাস এনজাইনা (Decubitus angina) নামে পরিচিত।

করোনারি হৃদরোগ : প্রকার ও ধরন

করোনারি হৃদরোগ মূলত দুধরনের : এনজাইনা পেকটোরিস (Angina Pectoris) ও মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (Myocardial Infarction)।

করোনারি ধমনীতে চর্বি জমে ব্লকেজ সৃষ্টি হতে শুরু করলে এর মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল কমে আসে। যার ফলে হৃৎপিণ্ডের সে নির্দিষ্ট অংশে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ হতে পারে না এবং হৃৎপিণ্ডের কোষগুলো বঞ্চিত হয় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি থেকে। তখন বুকে ব্যথা হতে শুরু করে। এটাই এনজাইনা পেকটোরিস।

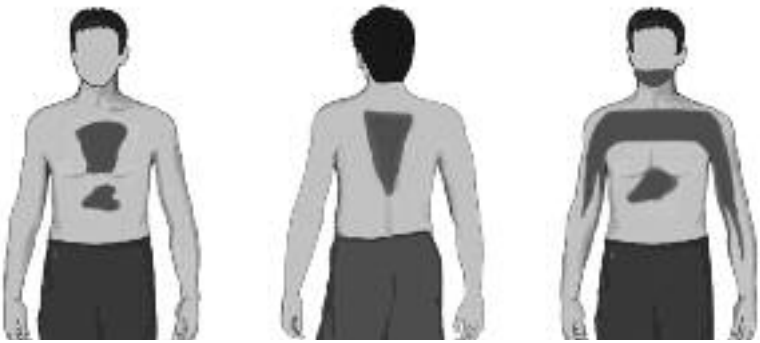

শরীরের এসব অংশেও করোনারি হৃদরোগজনিত ব্যথা হতে পারে (ছাই রঙ চিহ্নিত)

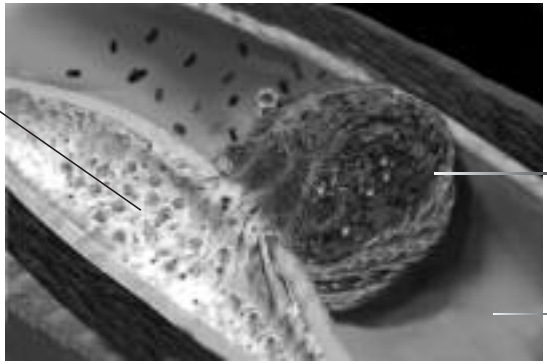

করোনারি ধমনীতে জমে থাকা কোলেস্টেরল ও ব্লাড ক্লটের ফলে রক্ত চলাচলের পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফলাফল হার্ট অ্যাটাক।

আর এই ব্লকেজের পরিমাণ যদি বাড়তে বাড়তে শতভাগ হয়ে যায় এবং ধমনী-পথে রক্ত চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে আসে, তখনই ঘটে হার্ট অ্যাটাক। চিকিৎসা পরিভাষায় যা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন নামে পরিচিত। রোগী এ সময় বুকে তীব্র ও অসহনীয় ব্যথা অনুভব করেন। এ ব্যথা কখনো কখনো বুক, গলা, ঘাড়, ওপরের পেট, দুই হাত এবং পিঠেও চলে যেতে পারে। সাথে শ্বাসকষ্ট, বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে। রোগী ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং জরুরি চিকিৎসা নিতে ব্যর্থ হলে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে দুধরনের ব্যথাকে বলা হয় অব্যক্ত ব্যথা বা অবর্ণনীয় ব্যথা (Unexplainable pain)। যার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রসব বেদনা– সন্তান প্রসব করেছেন যে মা, তিনি ছাড়া আর কারো পক্ষে এ ব্যথার তীব্রতা বোঝা সম্ভব নয়; আর অন্যটি হচ্ছে এই হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা। যাদের এ অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তারাই কেবল বিষয়টি বুঝতে কিংবা অনুভব করতে পারেন।

মুখভঙ্গিই বলে দিচ্ছে কী অবর্ণনীয় ব্যথা

জানা চাই করোনারি হৃদরোগের কারণ

চিকিৎসাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা করোনারি হৃদরোগের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি কারণকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন।

বয়স

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বয়স যত বাড়তে থাকে হৃদরোগের আশঙ্কাও তত বাড়তে থাকে। আমরা যদি দেখি, হৃদরোগ সাধারণত কোন বয়সে হয়? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি হয় চল্লিশ বছর বয়সে এসে বা তার পরে। কেন?

সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীরা এর একটা কারণ খুঁজে বের করেছেন। সেটি হলো, চল্লিশ হচ্ছে এমন একটি বয়স যে বয়সে এসে একজন মানুষ জীবনের অঙ্ক মেলাতে শুরু করেন–কী চেয়েছিলাম, আর কী পেলাম?

বিষয়টা আরেকটু স্পষ্ট করা যাক। শৈশব থেকে মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই তার কিছু স্বপ্ন থাকে। তারুণ্যে পৌঁছে সে দেখে একটি সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন–এমন একটি চাকরি বা ব্যবসা করবো, এরকম একটি সামাজিক অবস্থান আমার হবে কিংবা এমন একজন জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী হবে। একসময় সে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তখন শুরু হয় স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার দ্বন্দ্ব। তার স্বপ্নের পরিধিও ক্রমশ ছোট হতে থাকে। বাড়তে থাকে না-পাওয়ার অতৃপ্তি আর কষ্ট।

একসময় সে চল্লিশের কোঠায় পৌঁছে যায় বা বয়স চল্লিশ বছর পার হয়, সে তখন ফিরে তাকায় তার ফেলে আসা জীবনের দিকে। নিজেই বুঝতে পারে–যা চেয়েছিলাম তার অনেক কিছুই পাওয়া হয় নি। ভেতরে তখন শুরু হয় এক ধরনের অতৃপ্তি আর অশান্তি। কেউ ভোগেন না-পাওয়ার বেদনায়, কেউ-বা ভুগতে থাকেন বিষণ্নতায়। 'মেরা জীবন কোরা কাগজ কোরাহি রেহেগায়া...' বা 'যা পেয়েছি আমি তা চাই না, যা চেয়েছি কেন তা পাই না....' হয়ে ওঠে হয়তো তার প্রিয় গান। এই যে দিনের পর দিন তিনি কষ্টে ভোগেন, এটি শুধু মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই বিষণ্নতা-আক্রান্ত ও ব্যথাতুর হৃদয়ের প্রভাব নিশ্চিতভাবেই পড়ে তার হৃদযন্ত্রেও।

অন্যান্য মনোদৈহিক রোগগুলোর মতো করোনারি হৃদরোগের অন্যতম কারণও মূলত এই হাহাকার। কারণ, জীবনের অঙ্ক যদি না মেলে তবে অন্য সব অঙ্ক বৃথা হয়ে যেতে পারে। একবার যদি এ অতৃপ্তি ভেতরে জেঁকে বসে

আর সর্বক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে যে, যা চেয়েছিলাম তা পেলাম না, কেন পেলাম না, না পেয়ে কী হারালাম–তবে আর রক্ষা নেই। আপনার সমস্ত অর্জন তখন আপনার কাছে ফিকে হয়ে যেতে পারে। ব্যর্থতার অনুভূতি প্রায় সারাক্ষণই আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াতে পারে। আর এটিই একসময় হয়ে উঠতে পারে হৃদরোগসহ অন্যান্য মনোদৈহিক রোগের কারণ।

লিঙ্গভেদে

হৃদরোগ হওয়ার প্রবণতা পুরুষদের তুলনামূলক বেশি। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনোপজ অর্থাৎ ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়তে থাকে। এছাড়াও মহিলাদের মধ্যে যারা নিয়মিত জন্মবিরতিকরণ ওষুধ সেবন করেন, তাদের করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

জেনেটিক বা বংশগত

বাবা-মায়ের হৃদরোগ থাকলে তাদের সন্তানদেরও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। গবেষকদের মতে, এর মূল কারণ হচ্ছে পারিবারিক ভুল খাদ্যাভ্যাস ও ধূমপানের ইতিহাস। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একজন মানুষ শৈশব থেকে প্রায় সব ব্যাপারেই পারিবারিক রীতি ও আচার-ঐতিহ্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। যেমন, বাবা ধূমপায়ী হলে সন্তানেরও ধূমপায়ী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারণ সে-ও বাবার মতো হতে চায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্কুল-জীবনেই সে ধূমপানের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

খাদ্যাভ্যাসও এমনই একটি পারিবারিক ব্যাপার। পরিবারে যেমন খাদ্যাভ্যাস চালু থাকে জীবনের শুরু থেকেই মানুষ সাধারণত সেই খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাই মূলত পারিবারিক ভুল খাদ্যাভ্যাস এবং ধূমপানই বংশগত হৃদরোগের অন্যতম কারণ।

ধূমপান

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা ইউনিভার্সিটির স্কুল অব পাবলিক হেল্‌থ ও সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এক যৌথ গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, অল্প বয়সেই হার্টের রক্তনালী সংকুচিত হয়ে যাওয়া এবং হার্ট অ্যাটাকের জন্যে যেসব কারণকে দায়ী করা হয় তার মধ্যে ধূমপানের অবস্থান শীর্ষে।

এছাড়াও, হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৪০ বছরের কম বয়সী রোগীদের ওপর একটি জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের শতকরা ৮৫ ভাগই ছিলো ধূমপায়ী।

উচ্চ রক্তচাপ

করোনারি হৃদরোগের একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কারণ হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ। ধমনীর ভেতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় এটি ধমনীর গায়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় চাপ দেয়। আর এই চাপটা যদি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেড়ে যায়, সেটিই উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন।

অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ থাকলে করোনারি ধমনীর ভেতরের অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। রক্তের মধ্যে থাকা অতিরিক্ত কোলেস্টেরল সেই ক্ষতের জায়গাটিতে আটকে যায়। এভাবে রক্ত চলাচলের পথে পরবর্তীতে আরো কোলেস্টেরল একটু একটু করে সেই একই জায়গায় জমতে থাকে। যার ফলাফল করোনারি ব্লকেজ।

রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য

হৃদরোগের আরেকটি ঝুঁকি হচ্ছে রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য, যার অন্যতম কারণ ভুল খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাব।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস একটি নীরব ঘাতক। শরীরের প্রায় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপরই এর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। হৃৎপিণ্ডও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক বেশি। ডায়াবেটিস একাই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় প্রায় ৩৩ শতাংশ। আর এর সাথে উচ্চ রক্তচাপ যোগ হলে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬ শতাংশে।

অতিরিক্ত ওজন এবং মেদস্থূলতা

অতিরিক্ত ওজন যাদের, তাদের শরীরে রক্ত সরবরাহ করতে হৃৎপিণ্ডকে তুলনামূলক বেশি কাজ করতে হয়। এটিও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। মূলত খাবার থেকে পাওয়া ক্যালরির পরিমাণ ও এই ক্যালরি ব্যবহারে অসামঞ্জস্যতাই অতিরিক্ত ওজনের কারণ। মাত্রাতিরিক্ত ওজনের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের আধিক্য ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বেড়ে যায় অনেকগুণ।

শারীরিক পরিশ্রমের অভাব

আধুনিক ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ জীবনে সবাই আমরা কমবেশি গা ভাসিয়ে দিয়েছি। অথচ শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় ও পরিশ্রমহীন অলস

জীবনযাপনে অভ্যস্ত যারা, তাদের অকালমৃত্যু ও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার হার কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্তদের চেয়ে তুলনামূলক বেশি। তাই হয়তো বলা হয়ে থাকে 'যত আরাম তত ব্যারাম'।

সবমিলিয়ে এগুলোই করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান ঝুঁকি ও কারণ। এগুলোর একটি বা একাধিক ঝুঁকি যদি একজন মানুষের জীবনে বিদ্যমান থাকে, তবে হৃদরোগের আশঙ্কাও তার সেই অনুপাতে বাড়ে।

অবশ্য করোনারি হৃদরোগের কারণ আলোচনায় এটাই শেষ কথা নয়; চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোও তা-ই বলছে। কারণ, কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায়, অতিরিক্ত ওজন, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস কিংবা মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল–এসব কোনো সমস্যাই নেই, অথচ তিনি করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আবার দেখা গেল, ৮০ বছর বয়সেও বাবার হৃদযন্ত্র দিব্যি সুস্থ, কিন্তু ছেলের ৪০ না পেরোতেই হার্ট অ্যাটাক।

করোনারি হৃদরোগের পেছনে কি তাহলে এগুলো ছাড়াও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কারণ আছে? আছে বৈকি। সেটি হলো, জীবন সম্পর্কে আমাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি এবং এ থেকে সৃষ্ট স্ট্রেস বা মানসিক চাপ, যাকে আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি টেনশন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ বিষয়টি আমাদের কাছে ধীরে ধীরে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২

ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি, টেনশন ও স্ট্রেস ॥ করোনারি হৃদরোগের অন্যতম কারণ

শুধু হৃৎপিণ্ডই নয়, আছে হৃদয়েরও ভূমিকা

করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকিগুলো সম্বন্ধে আমরা আগের অধ্যায়ে জেনেছি। এখন এর পেছনের মূল হোতা বা গডফাদারকে আমরা চিনতে চেষ্টা করবো। গত কয়েক দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, হৃদরোগের অন্যতম কারণ মানসিক। আর এর পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা আছে যার, সেটি হলো ক্রমাগত টেনশন ও স্ট্রেস।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এ বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দিচ্ছেন। কেননা গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য কিংবা ধূমপানের অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র স্ট্রেসের কারণেই একজন মানুষ করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

গবেষকদের মতে, ধমনীতে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজ সৃষ্টি হলেই যে কেবল হার্ট অ্যাটাক হবে, তা নয়। কোরিয়ার যুদ্ধের সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সে সময় রণক্ষেত্রে নিহত সৈনিকদের নিয়মিত অটোপসি করা হতো। চিকিৎসকরা সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন, নিহত তরুণ সৈনিকদের শতকরা ৭০ জনেরই করোনারি ধমনী কোলেস্টেরল জমে বন্ধ হয়ে আসছিলো (Advance Stage of Atherosclerosis)। এদের মধ্যে ১৯ বছর বয়সী তরুণ সৈনিকও ছিলো।

তখন প্রশ্ন উঠলো, কোলেস্টেরল জমে ধমনীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়াই যদি হার্ট অ্যাটাকের কারণ হয়, তবে এসব তরুণ সৈনিকের মৃত্যু তো গুলির আঘাতে নয়, বরং যুদ্ধে আসার আগেই বাড়িতে বসে হার্ট অ্যাটাকে মারা যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু ধমনীতে এই পরিমাণ ব্লকেজ নিয়েও তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

তা-ই শুধু নয়, দেখা গেছে, ধমনীতে ৮৫% ব্লকেজ নিয়ে একজন মানুষ

ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিয়েছেন। আবার এমনও হয়েছে, ধমনীতে কোনো ব্লকেজ নেই কিন্তু হঠাৎ করেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। এর কারণ কী?

হৃদযন্ত্রের আসল শত্রু : টেনশন ও স্ট্রেস

আধুনিক পুঁজিবাদী ভোগবাদী সভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ হলো টেনশন। হৃদরোগীদের কেউ কেউ বলেন, সারাজীবন নিয়ম মেনে চলেছি, স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েছি, কোলেস্টেরলের পরিমাণও ছিলো স্বাভাবিক, আমার কেন হার্ট অ্যাটাক হলো? কিন্তু যদি তার পুরো কেস-হিস্ট্রি অর্থাৎ পারিবারিক সামাজিক পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয় তবে হয়তো দেখা যাবে, আজীবন তিনি স্ট্রেস নিয়েই বেঁচে ছিলেন। কিংবা দৈনন্দিন ছোটখাটো সব ব্যাপারেই তিনি ভীষণ টেনশনে ভুগতেন।

আমরা মানুষ। সমাজে বাস করি। মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে সবাইকে নিয়ে আমাদের পরিবার। এছাড়াও আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সহকর্মী, বন্ধুদের নিয়ে আমাদের বৃহত্তর পরিবার। জীবনে সবাইকে নিয়ে ও সবার সাথে চলার পথে নানা ঘটনার আবেগীয় প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি জমা হয়। কখনো-বা এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে স্ট্রেস। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দেখা যায়, আমরা কেউ কেউ খুব সহজেই এসবের সাথে মানিয়ে নিতে পারি, অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু ভুলে যেতে পারি। কিন্তু অনেকে আছেন যারা এটা পারেন না, বরং দিনের পর দিন ভেবে ভেবে একসময় হতাশা, দুশ্চিন্তা আর বিষণ্নতায় আক্রান্ত হন।

আসলে সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন ক্রমাগত স্ট্রেস আমাদের জীবনের স্বাভাবিকতাকে ব্যাহত করে। হৃদয়ের পাশাপাশি তখন আক্রান্ত হয় হৃদযন্ত্রও, যার অন্যতম পরিণতি করোনারি হৃদরোগ এবং অন্যান্য মনোদৈহিক রোগব্যাধি। মার্কিন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ক্রিচটন দীর্ঘ গবেষণার পর দেখিয়েছেন যে, হৃদরোগের কারণ প্রধানত মানসিক।

অনেকে মনে করেন, এনজিওগ্রামে ব্লক ধরা পড়েছে, এখন স্টেন্ট বা রিং লাগিয়ে নিলে কিংবা বাইপাস অপারেশন করে নিলেই হবে, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি আর নেই। কিন্তু সত্য হলো, স্ট্রেস বা টেনশনের বৃত্ত থেকে যদি একজন মানুষ বেরিয়ে আসতে না পারেন, তবে হৃদরোগের ঝুঁকিমুক্ত থাকা তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা তার শেষপর্যন্ত থেকেই যায়, আর্টারিতে যে কয়টাই স্টেন্ট লাগানো হোক।

টেনশন ও স্ট্রেস-এর কারণ জানা জরুরি

ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি

যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোর চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. মেয়ার ফ্রেডম্যান এবং ডা. রে রোজেনম্যান দীর্ঘ গবেষণার পর দেখান যে, হৃদরোগের সাথে অস্থিরচিত্ততা, বিদ্বেষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভুল জীবনাচরণের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। আর এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে জীবন সম্পর্কে আমাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি।

টেনশনের প্রথম কারণ হচ্ছে এই ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি। নাই নাই, খাই খাই, চাই চাই; অর্থাৎ শুকরিয়া নাই। আমরা কৃতজ্ঞচিত্ত হতে পারছি না। বলতে পারছি না–শোকর আলহামদুলিল্লাহ বা প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি অনেক দিয়েছো, আমি কৃতজ্ঞ। ফলে আমাদের অশান্তিও দূর হচ্ছে না। টেনশনমুক্ত হতে পারছি না বলে হরেক রকম ওষুধ হয়ে উঠেছে আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। আর হৃদরোগীর সংখ্যাও বেড়েই চলেছে দিন দিন।

ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স

ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স (Fight or flight response) হচ্ছে আমাদের অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের একটি স্বয়ংক্রিয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন গুহা বা জঙ্গলে ছিলো তখন হিংস্র বন্যপ্রাণীদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তাদের একটাই পথ ছিলো–হয় প্রাণীটার সাথে লড়তে হবে অথবা এত জোরে দৌড়াতে হবে যাতে সেই প্রাণীটা তাকে ধরতে না পারে।

এখন আমরা নাগরিক মানুষ, লোকালয়ে থাকি। বন্যপ্রাণীর সাথে লড়াই করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু এই ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্সটা আমাদের নার্ভাস সিস্টেমে থেকে গেছে। সেটা কীরকম? ধরুন, সন্ধ্যাবেলা আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন, সামনে একটা সাপ ফনা তুলে আছে। আপনার চোখ সাপ দেখার সাথে সাথে স্নায়ুর মাধ্যমে ব্রেনে মেসেজ পাঠালো–সামনে সাপ! প্রস্তুত হও! ব্রেন এবার আপনার শরীরের পেশি এবং স্নায়ুতে খবর পাঠাচ্ছে যে, সামনে সাপ, প্রস্তুত হও। পরবর্তী নির্দেশনা ও কাজের জন্যে সব স্নায়ু ও পেশি চূড়ান্ত প্রস্তুত হলো এবং ব্রেনে খবর পাঠালো, আমি প্রস্তুত। ব্রেন তখন ভাবছে, পেশি যখন প্রস্তুত তাহলে চোখ যে তথ্যটা দিয়েছে সেটা ঠিক, সে আবার তাগাদা দিতে থাকে–আরো প্রস্তুত হও! পেশি আবার খবর পাঠাচ্ছে, আমি আরো প্রস্তুত। ব্রেন বলে, আরো প্রস্তুত হও! ঠিক এইখানটায় এসে দুষ্টচক্র শুরু হয়ে গেল।

এই 'আমি প্রস্তুত' আর 'আরো প্রস্তুত হও' চক্রটি চলতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি আপনার মনোযোগটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে পারছেন। মজার ব্যাপার হলো, সত্যিকার সাপ দেখলে আপনার ব্রেন ও স্নায়ুতে যে প্রতিক্রিয়া হতো, আপনি যদি চিন্তা করতে থাকেন যে, সামনে সাপ, ব্রেন তখনো ঠিক একইভাবে প্রতিক্রিয়া করবে।

অর্থাৎ বিপদ যতই দূরে থাকুক, আপনি যখনই কোনো কারণে বিপদের আশঙ্কা করছেন, বিপদ এলে কী হবে, আপনি কী করবেন–এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, আপনার মধ্যে তখন চলতে থাকে এই ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্সের এক নিদ্রাহীন দুষ্টচক্র।

বহন করে বেড়ানো

টেনশনের অন্যতম একটি কারণ হলো বহন করে বেড়ানো। সেটা কেমন? ধরা যাক, অফিসে বস আপনাকে তুচ্ছ কারণে হয়তো বকাঝকা করেছেন। তিনি একতরফা বলেছেন, আপনাকে চুপচাপ শুনে যেতে হয়েছে। কিছুই বলতে পারেন নি, তাই রাগও কমে নি, ভেতরে ভেতরে কেবল ফুঁসছেন।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে ঢুকেই অকারণে চিৎকার চেঁচামেচি আর স্ত্রীর ওপর রাগ ঝাড়তে শুরু করলেন–তোমার জন্যে আজকে আমার এই অবস্থা! যদিও সে বেচারির এখানে কোনোরকম ভূমিকাই নেই, তিনি তো আর আপনার অফিসে যান নি। কিন্তু আপনি দিলেন বাসার শান্তিটা নষ্ট করে। আবার এমনও হতে পারে–স্ত্রী হয়তো আপনার চেয়ে এক ডিগ্রি চড়া, বাসায় স্ত্রীর কাছে ঝাড়ি খেলেন, কিছুই বলতে পারলেন না। অফিসে গিয়ে নিতান্ত তুচ্ছ কারণে পিয়নকে বকাবকি শুরু করে দিলেন।

এখানে কী হলো? অফিসের সমস্যা বাসায় এনে বাসার পরিবেশটা তিক্ত করে তুললেন আর বাসার সমস্যা অফিসে নিয়ে গিয়ে অফিসে অশান্তি সৃষ্টি করলেন। আমরা অধিকাংশ মানুষ এভাবেই বহন করে বেড়াই। যে জিনিসটা যেখানে রেখে আসা উচিত, সেটা সেখানে রেখে আসতে পারি না। এমন ছোটখাটো অসংখ্য ঘটনা আমাদের জীবনকে স্ট্রেস-আক্রান্ত করে তোলে।

ক্রমাগত দুশ্চিন্তা ও স্ট্রেস যে করোনারি ধমনীতে ব্লকেজের কারণ, তা বোঝা যায় ডা. আলবা সাবাই পরিচালিত একটি গবেষণায়। তিনি বৈরুতে কিছু মানুষের ওপর একটি গবেষণা চালান, একযুগেরও বেশি সময় ধরে যারা বিভিন্ন কারণে স্ট্রেস-আক্রান্ত ছিলেন। তাদের এনজিওগ্রাম করে ডা. সাবাই প্রত্যেকের করোনারি ধমনীতে ব্লকেজ শনাক্ত করেন।

পণ্যদাসত্ব কেবল অশান্তিই বাড়ায়

টেনশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে পণ্যদাসত্ব। ইংরেজিতে যাকে বলে কনজ্যুমারিজম। বিশ্বজুড়ে এটি এখন একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। যার প্রভাবে আমরা প্রতিনিয়ত শুধু কিনেই চলেছি, প্রয়োজন থাকুক আর না-ই থাকুক। যত কিনছি তত বাড়ছে আমাদের অভাববোধ আর অতৃপ্তি। সেইসাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আমাদের অশান্তি। কারণ, বস্তু কখনো শান্তি দিতে পারে না।

মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের শতকরা ৮০ ভাগ কেনাকাটাই হচ্ছে আবেগের কেনাকাটা। যাকে বলে চোখের ক্ষুধা। যেমন, আপনার আইসক্রিম খাওয়ার কথা মনেও হয় নি কিন্তু একজনকে দেখলেন আইসক্রিম খাচ্ছে, অমনি আপনারও মনে হলো–আহা, আমিও একটা আইসক্রিম খাই। এই ক্ষুধাটা হচ্ছে চোখের ক্ষুধা। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, আবেগের কেনাকাটা অর্থাৎ শতকরা ৮০ ভাগ কেনাকাটা না করলেও একজন মানুষ খুব সুন্দরভাবে তার জীবনধারণ করতে পারে।

পণ্যদাসত্ব কেবল অশান্তির মাত্রাই বাড়ায়। আমেরিকানদের কথাই ধরুন–জনসংখ্যার দিক থেকে তারা পৃথিবীর মাত্র পাঁচ শতাংশ, আর পৃথিবীর মোট সম্পদের ৫৫ শতাংশের মালিক তারা। কিন্তু তারপরও তাদের জীবনে কি শান্তি আছে? আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশি যে ওষুধটি বিক্রি হয় সেটি ট্র্যাঙ্কুইলাইজার। অর্থাৎ অশান্তি ওখানেই সবচেয়ে বেশি।

আপনি ভাবলেন, একটা বাড়ি থাকলে ভালো হতো। অনেক কষ্টে একটা বাড়ি বানালেন। কিছুদিন পর ভাবলেন, একটা ফ্ল্যাট না থাকলে কেমন হয়? শুরু হলো ফ্ল্যাটের জন্যে ছোটা। এভাবে যত কিনছেন, অভাব বাড়ছেই। কবিগুরুর সেই বিখ্যাত কবিতা–'এ জগতে হায়, সে-ই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি, রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।'

কীভাবে কাঙালের ধন চুরি করে? তাকে কিনতে অভ্যস্ত করে। কারণ, যত সে কিনবে, তার টাকা কমতে থাকবে। ওদিকে ঠিকই বাড়তে থাকবে ধনীদের টাকা। সেই টাকা থেকেই ধনীরা আবার ঋণ দেয় তাকে, যাতে সে আরো কিনতে পারে। এভাবে কিনতে কিনতেই সে একসময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আক্ষরিক অর্থেই সে তখন হয়ে ওঠে পণ্যদাস। পণ্যের জন্যে সবসময় নিজেকে বিক্রি করতেও প্রস্তুত থাকে। আর যত সে কিনছে, বাড়ছে অশান্তি। সেইসাথে বাড়ছে টেনশন।

টেনশন ও ক্রমাগত স্ট্রেস ॥ বাড়িয়ে চলেছে হৃদরোগের ঝুঁকি

আমরা দেখলাম, আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, নেতিচিন্তা, আবেগের আগ্রাসন আর ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টির কারণে চাওয়া এবং পাওয়ার ফারাক অর্থাৎ জীবনের অঙ্ক মেলাতে না পারার হাহাকার ও পণ্যদাসত্ব আমাদের মধ্যে সারাক্ষণই এক দুঃসহ স্ট্রেস তৈরি করে চলেছে। সবমিলিয়ে ভেতরে চলছে এক অবিশ্রান্ত ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। ফলে প্রায় সারাক্ষণই সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম উদ্দীপ্ত থাকছে এবং নিঃসৃত হচ্ছে বিভিন্ন স্ট্রেস-হরমোন : এড্রিনালিন, নর-এড্রিনালিন, কর্টিসল।

দিনের পর দিন এ অবস্থা চলতে থাকলে শরীরের স্নায়ু ও পেশিগুলো যে পরিমাণে সংকুচিত হয় সে অনুপাতে শিথিল হতে পারে না। যার ফলাফল নানারকম সাইকোসোমাটিক বা মনোদৈহিক রোগব্যাধি। এ অযাচিত সংকোচন হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীকেও ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করে (Coronary artery spasm), যা ধমনী-পথে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলকে ব্যাহত করে। শুধু তাই নয়, সারাক্ষণই মাত্রাতিরিক্ত স্ট্রেস-হরমোনের প্রভাবে শরীরে সৃষ্টি হয় অস্থিরতা, অনিদ্রা এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা। ফলে বেড়ে যায় করোনারি ধমনীতে ব্লকেজ তৈরির সম্ভাবনা।

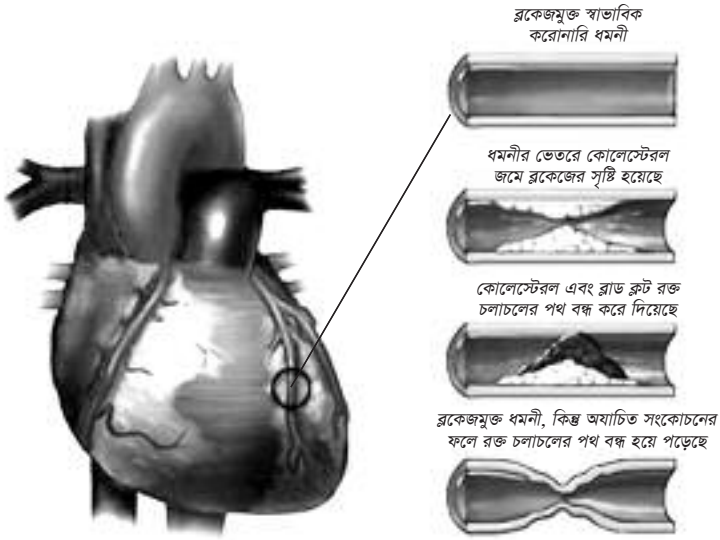

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, স্ট্রেস-এ থাকাকালে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, খাদ্যাভ্যাস যেমনই হোক না কেন। যুক্তরাষ্ট্রে একটি কার রেসিং-এর পূর্বে ৫০০ প্রতিযোগীর রক্ত পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর আরেকবার রক্ত পরীক্ষা করা হয়। দেখা গেছে, রেসের পূর্বে তাদের প্রত্যেকের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি ছিলো। এছাড়াও আমেরিকায় ট্যাক্স-একাউন্টেন্টদের লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় ট্যাক্স জমা দেয়ার আগে-পরের সময়টাতে তাদের রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি থাকে।

হৃদরোগসহ অন্যান্য মনোদৈহিক রোগের সাথে টেনশন ও স্ট্রেসের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের দেশে অনেক দেরিতে কাজ শুরু হলেও, যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে সেই ষাটের দশকে। কারণ, ইউরোপ-আমেরিকায় টেনশনের আগ্রাসন শুরু হয়েছে সেই পঞ্চাশের দশকে।

এ গবেষণায় মূল নেতৃত্ব দিয়েছেন আমেরিকার হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ও প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. হার্বার্ট বেনসন। বোস্টনের ম্যাসাচুসেট্স জেনারেল হাসপাতালে তিনি 'মাইন্ড বডি ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে টেনশনের মনোদৈহিক প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ ৩০ বছর গবেষণা করে তিনি দেখিয়েছেন, সাধারণভাবে যে রোগগুলোর সাথে আমরা বেশি পরিচিত তার একটা বড় অংশের সাথেই রয়েছে টেনশনের নিবিড় যোগাযোগ। যেমন : উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, বিভিন্ন রকম পেটের পীড়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস্ট্রিক আলসার, আইবিএস, ঘাড় ও মাথাব্যথা, অবসাদ, অনিদ্রা, হাত-পায়ের তালু ঘামা ইত্যাদি।

শারীরিক উপসর্গ হিসেবে প্রকাশ পেলেও এসব রোগের আসল উৎস কিন্তু মন। মনে দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে জমতে থাকা কষ্ট, টেনশন, স্ট্রেস বা মানসিক চাপ। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় তাই এ রোগগুলোকে বলা হয় সাইকোসোমাটিক ডিজিজ বা মনোদৈহিক রোগ।

আমরা যদি দেখি, টেনশন সৃষ্টি হলে শরীরে কী হয়? টেনশনের ফলে স্নায়ু এবং পেশি সংকুচিত (Tense) হয়। বিশ্রাম বা ঘুম পেশির এই অযাচিত সংকোচন দূর করতে পারে। কিন্তু স্নায়ুর টেনশন বিশ্রাম বা ঘুমে দূর হয় না। এটি থেকেই যায় এবং ক্রমাগত এ অবস্থা চলতে থাকলে একসময় এই রোগগুলোর সূত্রপাত ঘটে। তাই স্নায়ুর টেনশন দূর করা অত্যন্ত জরুরি। আর সেজন্যে চাই শিথিলায়ন। একমাত্র গভীর শিথিলায়নই পারে দেহের সব স্নায়ু-পেশিকে শিথিল করে তুলতে।

টেনশনমুক্তির জন্যে চাই শিথিলায়ন

চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই অভাবনীয় অগ্রগতির যুগেও টেনশনমুক্তির জন্যে কোনো কার্যকরী ওষুধ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনগুলো সম্পর্কে যারা সচেতন তারা জানেন যে, কার্যকরীভাবে টেনশন দূর করার বিজ্ঞানসম্মত উপায় হচ্ছে শিথিলায়ন (Relaxation)। একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এ বিষয়টি আজ প্রমাণিত সত্য।

টেনশন বা স্ট্রেস-এর ফলে শরীরের সব স্নায়ু, পেশি ও কোষগুলো উদ্দীপিত হয়ে ওঠে এবং পুরো শরীরে একটা ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, শিথিলায়নে দেহের প্রতিটি কোষকে শিথিল করা হয়, শুইয়ে দেয়া হয়। শিথিলায়নে দেহের প্রতিটি কোষের প্রতি নিবিড় মমতাপূর্ণ মনোযোগ দেয়া হয়।

শিথিলায়নকালে একজন মানুষ তার মনের গভীরে প্রবেশ করে। মন প্রশান্ত হয়। তখন ব্রেন থাকে সবচেয়ে কার্যকরী অবস্থায় অর্থাৎ আলফা লেভেলে। শিথিলায়নে ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি হয়। নিয়মিত শিথিলায়নে মনে একটা স্থায়ী প্রশান্তি আসে, ফলে বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো তখন মনকে খুব সামান্যই প্রভাবিত করে। আর দুশ্চিন্তা ও শিথিলায়ন একসাথে সম্ভব নয়। কারণ, শরীর শিথিল হলে দেহ-মনে কখনো টেনশন বা দুশ্চিন্তা থাকে না।

নিয়মিত শিথিলায়ন অনুশীলনে মনের নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক আবেগগুলো ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে থাকে। প্রফেসর ডা. হার্বার্ট বেনসন দীর্ঘ গবেষণার পর প্রমাণ করেছেন যে, গভীর শিথিলায়নে হার্টবিট কমে, দেহে ব্যথা বা আঘাতের অনুভূতি হ্রাস পায়, উচ্চ রক্তচাপ কমে, দমের গতি ধীর হয়ে আসে, রক্তে ল্যাকটেট ও এড্রিনালিন-এর পরিমাণ হ্রাস পায়, প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের তৎপরতা বাড়ে, দেহকোষে অক্সিজেন গ্রহণের চাহিদা কমে। সেইসাথে বাড়ে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শরীর আপনা থেকেই রোগমুক্তির প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে।

সবশেষে বলা যায়, শিথিলায়নের আনন্দই আলাদা। শরীর-মনে এটি এমন এক সুখ ও আনন্দ-অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা শুধুই অনুভবের বিষয়। তাই শিথিলায়নের প্রাথমিক প্রাপ্তি হচ্ছে প্রশান্তি। আপনি যত শিথিলায়নের গভীরে প্রবেশ করতে পারবেন ততই প্রশান্তিতে অবগাহন করবেন। শিথিলায়ন হলো মন নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত মেডিটেশনের প্রথম স্তর।

ব্রেন ওয়েভ

আমরা জেনেছি, টেনশনমুক্তির জন্যে দরকার শিথিলায়ন। শিথিলায়নকে আমরা বলতে পারি যে, এটি হচ্ছে মেডিটেশনের মা। মেডিটেশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্রেনকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে পারবো এবং তখন রোগ নিরাময়ও হবে সহজ। এর আগে ব্রেন ওয়েভ সম্পর্কে আমাদের একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

মূলত ব্রেনের মাধ্যমেই আমরা প্রতিটি কাজ করে থাকি। সক্রিয় অবস্থায় ব্রেন থেকে প্রতিনিয়ত খুব মৃদু বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিকিরিত হয়। বিজ্ঞানীরা একে বলেন ব্রেন ওয়েভ। ১৯২৯ সালে ডা. হ্যান্স বার্জার ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফ (ইইজি) যন্ত্রের সাহায্যে এই ওয়েভ বা তরঙ্গ মাপেন। তিনি দেখান যে, আমাদের ব্রেনে পাঁচ ধরনের ওয়েভ বা তরঙ্গ রয়েছে।

ব্রেন ওয়েভ সারণি

	ফ্রিকোয়েন্সি সীমা	প্রধান লক্ষণসমূহ
স্থান কালে সীমাবদ্ধ বাহ্যিক সচেতন অবস্থা।	**গামা** ২৭ সাইকেল ও তার বেশি	পুরোপুরি অনুসন্ধান চালানো হয় নি। ক্রোধ ও অতি উত্তেজিত অবস্থায় এটা ঘটে থাকে।
	বিটা ১৪-২৬ সাইকেল	সাধারণ জাগ্রত অবস্থা, সক্রিয় মন, চিন্তা, গভীর মনোযোগ, দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ।
	আলফা ৮-১৩ সাইকেল	মনের প্রশান্ত অবস্থা, শিথিলকৃত অবস্থা, মেডিটেশন ও শিথিলায়নে এ ওয়েভ বজায় থাকে এবং ভাবাবেগ বা কোনো ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হলে এ ওয়েভে ছেদ পড়ে।
অন্তর্চেতনা অতিচেতনা প্রজ্ঞা স্থান কাল দ্বারা সীমিত নয়। অনন্ত চেতনা।	**থিটা** ৪-৭ সাইকেল	গভীর নিদ্রার পূর্বাবস্থা। থিটা লেভেল হচ্ছে উচ্চস্তরের সৃজনশীলতা ও সচেতনতার স্তর। মেডিটেশনকালে সাধকরা আলফা থেকে থিটা স্তরে প্রবেশ করেই মহাচৈতন্যের (Super conciousness) সাথে সংযোগ স্থাপন করতেন।
	ডেল্টা ০.৫-৩ সাইকেল	গভীর নিদ্রা। দরবেশ ঋষিরা এই স্তরেও সজাগ থাকেন। মহাচৈতন্যে লীন হতে পারেন।

মনের বাড়ি ও আলফা স্টেশন

এককথায় শিথিলায়ন বা মেডিটেশনের আনন্দকে বলা হয়ে থাকে নিজের বাড়িতে ফেরার আনন্দ। কারণ শিথিলায়নের পথ ধরেই মন তার একান্ত ভুবনে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। আর মন যখন সকল প্রকার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে সেখানে অবস্থান করে তখনই সে তার সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার সর্বোত্তম প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। তাই সাফল্যের পথে প্রো-একটিভ হওয়ার লক্ষ্যে মনের শক্তিকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে হলে আপনাকে প্রথমেই মনের জন্যে একটি মনোরম ও প্রশান্তিময় বাড়ি তৈরি করতে হবে। যেখানে আপনি দিনে রাতে যখন খুশি চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চলে যেতে পারবেন এবং নিজের ও মানবতার কল্যাণে মনের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবেন।

মনের বাড়ি আপনার পছন্দমতো যেকোনো শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থাপিত হতে পারে। যেমন নদী বা লেকের পাড়ে, দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি বা পার্কের মাঝে, কোনো পাহাড়ের চূড়ায়,হ্রদের মাঝে, কোনো ঝর্না, জলপ্রপাত বা সমুদ্র সৈকতে বা কোনো গভীর বনে কিংবা সমুদ্রের তলদেশে। যেখানেই আপনি মনের বাড়ি বানান না কেন, পরিবেশ এমন হতে হবে যা আপনাকে সবসময় প্রশান্তি দেবে। এই বাড়িতে অনেকগুলো কক্ষ থাকবে। আর তা থাকবে ফুল-ফল-লতা-গুল্মের বাগান পরিবেষ্টিত।

সৌন্দর্য ও আনন্দ যেন সবসময় ঘিরে থাকে আপনার মনের বাড়িকে। আপনার সবচেয়ে পছন্দের বাড়িকে মনের বাড়ি বানাবেন। মনের বাড়ির দহলিজ বা দরবার কক্ষ বেশ বড়সড় হবে। ডানদিকে একটি বারান্দা দিয়ে যাবেন বড় আরেকটি কক্ষে। আপনার নিরাময় কক্ষ বা হিলিং সেন্টার হিসেবে এ কক্ষটি কাজ করবে। এছাড়া আপনার প্রয়োজনে মনের বাড়িতে গবেষণা কক্ষ, রেওয়াজ কক্ষ, অভিনয় মঞ্চ, ইবাদত বা প্রার্থনা কক্ষ ইত্যাদি তৈরি করবেন। মনের বাড়িতে যখনই যাবেন তখনই প্রয়োজন অনুসারে কক্ষ সংস্কার, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারবেন।

মনের বাড়িতে যাওয়ার পথে রয়েছে আলফা স্টেশন, যেখানে থেকে আপনি মনের বাড়ির পথে যাত্রা শুরু করবেন। আলফা স্টেশন এমন একটি সুন্দর স্থান, যেখানে আছে ঘন বন, ঝর্না, লেক, সুন্দর বাগান ও একটি ওয়েটিং রুম। প্রথমবার মেডিটেশনের সময় আলফা স্টেশনে এগুলো কল্পনায় বানিয়ে নিন।

শিথিলায়নের সহজ প্রস্তুতি ও ধাপসমূহ

সাফল্য লাভে মনের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্যে মনের বাড়িতে যাওয়ার পথ হচ্ছে শিথিলায়ন। সহজ কিছু প্রস্তুতি ও নিয়মিত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আপনি তা আয়ত্ত করতে পারেন। আপনার অনুশীলনের সুবিধার্থে শিথিলায়নের পর্যায়গুলো এখানে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো।

১. শিথিলায়ন অনুশীলনের জন্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে একটি নিরিবিলি ঘর বেছে নিন। নিশ্চিত হোন এ সময় কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। রুমের দরজা বন্ধ করে নিতে পারেন। মোবাইল ফোনটি সুইচ-অফ করে রাখুন কিংবা অন্য ঘরে রেখে আসুন। ঘরের ভেতরে যাতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ঘর একেবারে অন্ধকার করে ফেলবেন না, হালকা আলো থাকবে।

দু-এক দিনের মধ্যে ঘটেছে এমন কোনো আনন্দদায়ক ঘটনা বা কোনো সুখানুভূতির কথা চিন্তা করুন। সে ঘটনা যত তুচ্ছই হোক না কেন, কিছু যায় আসে না। অনুভূতিটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

২. শক্ত বিছানায় অথবা মেঝেতে মাদুর বা পাতলা কার্পেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন। এভাবে শুতে অসুবিধে হলে মাথার নিচে পাতলা একটি বালিশ দিতে পারেন। তবে বিছানা যত শক্ত হয় ততই ভালো। শোয়ার পর হাত থাকবে দেহের দুপাশে, হাতের তালু থাকবে ওপরের দিকে। দুপায়ের মাঝখানে অন্তত চার আঙুল ফাঁক থাকবে।

বসেও আপনি শিথিলায়ন করতে পারেন। মাদুর পেতে কিংবা কার্পেটের ওপর সুখাসন বা পদ্মাসনে বসতে পারেন অথবা চেয়ারেও আরাম করে সোজা হয়ে বসতে পারেন। পদ্মাসনে বসলে হাতের আঙুল থাকবে হাঁটুর ওপর। আর সুখাসনে বসলে ডান হাত থাকবে বাম হাতের ওপর ঠিক নাভির নিচ বরাবর। চেয়ারে বসলে জুতা-মোজা খুলে গায়ের পোশাক একটু ঢিলে করে নিন। চেয়ারে এমনভাবে বসবেন, যাতে পায়ের পাতা ও আঙুল মাটি স্পর্শ করে এবং হাতের তালু থাকে হাঁটুর ওপর। মেরুদণ্ড ও ঘাড় থাকবে সোজা।

৩. হালকাভাবে চোখ বন্ধ করুন। ভ্রূ ও চেহারা কুঁচকাবেন না। চোখের দুই পাতাকে ধীরে ধীরে একসাথে লেগে যেতে দিন। চোখ বন্ধ করার সাথে সাথেই আপনি কোনোকিছু দেখা থেকে বিরত থাকছেন এবং সার্বক্ষণিক সক্রিয় ইন্দ্রিয় চোখকে বিশ্রাম দেয়ায় কিছু দেখে উত্তেজিত বা চিন্তাগ্রস্ত হওয়া থেকে রেহাই পাচ্ছেন।

৪. এবার নাক দিয়ে লম্বা দম নিন। আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেবেন বিশেষ পদ্ধতিতে। বুক ফুলিয়ে নয়, দম নেয়ার সাথে ধীরে ধীরে আপনার পেটের উপরিভাগ ফুলবে। আবার দম ছাড়ার সময় পেটের উপরিভাগ চুপসে যাবে। দম নেয়া ও ছাড়ার সময় ধীরে ধীরে পেটের ওপরের অংশ ওঠানামা করবে। দম নেয়ার চেয়ে দম ছাড়তে সামান্য বেশি সময় নিন। দম নিতে নিতে ভাবুন, 'প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি আমার দেহে প্রবেশ করছে।' আর দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন–'শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে।' এভাবে ৬ থেকে ১০ বার দম নেয়ার পর দম স্বাভাবিক হতে দিন। অর্থাৎ নাক দিয়ে দম নিয়ে নাক দিয়েই ছাড়তে থাকুন।

৫. আপনার চোখ বন্ধ আছে। এক মুহূর্তে মনের চোখে নজর বুলিয়ে যান মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত। এবার প্রথম ১০ সেকেন্ড মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন মাথার তালুর পেশিগুলোতে। মনোযোগ দেয়ার সাথে আপনি অনুভব করবেন সেখানে রক্ত চলাচল বাড়ছে। একটু গরম গরম লাগছে বা একটু শিরশির করছে। এরপর অনুভব করবেন, তালুর পেশি শিথিল হয়ে আসছে। ভারী হয়ে যাচ্ছে।

একইভাবে আপনি পর্যায়ক্রমে কপাল, চোখ ও চোখের পাতা, ঠোঁট ও জিহ্বা, চোয়াল, মুখমণ্ডল, গলা, ঘাড়, কাঁধ, ডান হাত, বাম হাত, বুক, পিঠ, মেরুদণ্ড, পেট, কোমর, নিতম্ব, ঊরু, হাঁটু, পা, গোড়ালি ও পায়ের পাতায় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন। প্রতিটি অঙ্গে ১০ সেকেন্ড করে মনোযোগ দিন। মনের চোখ দিয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গ অবলোকন করুন। অবলোকনের সাথে সাথে অনুভব করুন প্রতিটি অঙ্গে রক্ত চলাচল বেড়ে যাচ্ছে। পেশি শিথিল হয়ে ভারী হয়ে আসছে। (অনুশীলন শুরুর আগে কোন অঙ্গের পর কোন অঙ্গে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবেন তা কয়েকবার পড়ে মুখস্থ করে ফেলুন।)

আপনি যখন মাথা থেকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে পায়ের পাতা পর্যন্ত নামতে থাকবেন, তখন অনুভব করুন যে, বরফগলা পানি যেমন বরফের গা বেয়ে নিচের দিকে নামে, শিথিলতা তেমনি স্রোতের মতো আপনার গা বেয়ে মাথা থেকে পায়ের দিকে নেমে যাচ্ছে।

৬. ভাবুন, আপনার অঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে। এবার আবার পাঁচ বার নাক দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিয়ে বেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেয়ার চেয়ে ছাড়তে সময় একটু বেশি নিন। এরপর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে দিন।

৭. এবার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন দমের ওপর। বাতাস কীভাবে নাক দিয়ে ঢুকছে তা অনুভব ও মনের চোখে অবলোকন করুন। অনুভব ও অবলোকন করুন বাতাস কীভাবে ফুসফুসের প্রতিটি কোষে প্রবেশ করছে, আবার বেরিয়ে আসছে। দমের আসা-যাওয়ার ওপর আপনার মনোযোগ দিন। বাতাস স্বাভাবিক যাওয়া-আসা করবে, আপনি শুধু দমের প্রতি খেয়াল রাখুন। (এক থেকে দুই মিনিট আপনি দম অবলোকন করুন) এরপর অনুভব করুন আপনার শরীর ভারী লাগতে শুরু করেছে।

৮. এবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কীভাবে আপনার শরীরকে নিচের দিকে টানছে তা অনুভব করুন। নিজের ওজন অনুভব করুন। অনুভব করুন মাথার ওজন। কাঁধ বুক নিতম্ব হাত পায়ের ওজন বেড়ে গেছে তা খেয়াল করুন। অনুভব করুন তা ভারী হতে হতে জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে। অনুভব করুন দেহের জৈব কোষগুলো আর জৈবকোষ নেই, পরিণত হয়েছে বালুকণায়।

৯. অনুভব করুন, আপনার পুরো দেহ এখন বালুকণায় পরিণত হয়েছে। এবার অনুভব ও অবলোকন করুন, আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে বালুকণাগুলো ঝরে পড়তে শুরু করেছে। আঙুল হাত পা বুক পেট ঊরু– সব বালুর মতো ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। আপনি পরিণত হচ্ছেন এক বালুর স্তূপে। যত স্পষ্টভাবে সম্ভব কল্পনা করুন যে, আপনার পুরো শরীর সূক্ষ্ম বালুকণার স্তূপে রূপান্তরিত হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে।

১০. আপনি এখন সূক্ষ্ম বালুকণার স্তূপ। এখন আপনি অনুভব করুন উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে। বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। বাতাস ঝড়ের রূপ নিচ্ছে আর আপনার শরীরের অবশিষ্টাংশ হিসেবে যে বালুকণাগুলো রয়েছে ঝড় তা উড়িয়ে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আপনার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। আপনার বলতে এখন রয়েছে শুধু আপনার চেতনা, আপনার মন। আপনি এখন পরিপূর্ণরূপে শিথিল। শিথিলায়নের গভীর স্তরে পৌঁছে গেছেন আপনি। আপনার ব্রেন ফ্রিকোয়েন্সি বিটা স্তর থেকে নেমে গেছে আলফায়। মনের বাড়ির পথে এখন আপনি আলফা স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন। এই স্টেশনে আপনার জন্যে রয়েছে বিশেষ ওয়েটিং রুম।

এবার মনে মনে বলুন, আলফা স্টেশন থেকে এখন আমি আরো গভীরে মনের বাড়িতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমি যতক্ষণ মনের বাড়িতে থাকবো, ততক্ষণ বাইরের যেকোনো অপ্রয়োজনীয় শব্দে আমার মনোযোগ আরো গভীর হবে। তবে আগুন, ভূমিকম্প বা কোনো বিপজ্জনক বা জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি

হলে আমি যত গভীর লেভেলেই থাকি না কেন, মুহূর্তে পুরোপুরি জেগে উঠবো এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

১১. আলফা স্টেশন থেকে মনের বাড়িতে প্রবেশের জন্যে এবার বিশেষ কাউন্টডাউন শুরু করুন। মনে মনে ১৯ থেকে ০ গণনার পর আপনি আলোর পথ ধরে পৌঁছে যাবেন মনের বাড়িতে। ১৯ উচ্চারণের সাথে সাথে আপনি কল্পনায় অবলোকন করুন শীতল নীল স্নিগ্ধ আলো বর্ষিত হচ্ছে আপনার ওপর। আলোয় আপনি অবগাহন করছেন। আলোর এক দীর্ঘ পথ রচিত হয়েছে আপনার জন্যে। আর সে পথ পৌঁছে গেছে মনের গভীর স্তরে। আপনি ১৮, ১৭, ১৬, ১৫, ১৪, ১৩, ১২, ১১ উচ্চারণ করুন। এবার মনে মনে বলুন, 'আলোর পথ দিয়ে আমি পৌঁছে যাচ্ছি মনের গভীর থেকে গভীরে।' আবার ১০, ৯, ৮, ৭, ৬। 'গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে যাচ্ছি আমি।' ৫, ৪, ৩, ২, ১, ০ উচ্চারণ করুন।

মনে মনে বলুন, 'আমি পৌঁছে গেছি মনের বাড়িতে।' আর অনুভব করুন এক অনাবিল প্রশান্তি।

১২. মনের বাড়িতে পৌঁছার পর আপনি প্রথমে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি উপভোগ করুন। ফুলের সুবাস, পাতার রং, পাখির কলতান, ঝর্নার শব্দ বা সমুদ্রের তরঙ্গ, আকাশে মেঘের ভেলা, যা যা দেখতে পান সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন, স্পর্শ করুন, অনুভব করুন।

১৩. এবার মনের বাড়ির দরবার কক্ষে আরাম করে বসুন।

১৪. মনের বাড়ি চেতনার এক শক্তিশালী স্তর। এ স্তরে পৌঁছার সাথে সাথে মন দেহের প্রতিরক্ষা ও নিরাময় ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোগমুক্তির কাজে নিয়োজিত করে। এ স্তরে মন যেকোনো কল্যাণমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্রেনকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে। মনের বাড়িতে আপনার যেকোনো 'অটোসাজেশন' মস্তিষ্ক সহজেই গ্রহণ করে। এবার ভবিষ্যতের কার্যক্রমের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করুন। মনে মনে বলুন, 'ভবিষ্যতে শিথিলায়নের উদ্দেশ্যে যখনই আমি চোখ বন্ধ করে আরাম! আরাম! আরাম! উচ্চারণ করবো তখনই আমার দেহ-মনের সকল অপ্রয়োজনীয় তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমি পরিপূর্ণ শিথিল হয়ে যাবো। এরপর ১৯ থেকে ০ গণনা করে পৌঁছে যাবো মনের বাড়িতে।'

এরপর মনকে আরো কিছু ইতিবাচক অটোসাজেশন দিতে পারেন। যেমন, মনে মনে বলতে পারেন, 'এখন থেকে আমার স্মৃতিশক্তি বাড়ছে। আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়ছে। আমার মনোযোগ বাড়ছে। আমার শরীর ও মন

সবসময় সুস্থ থাকছে। অমূলক ভয়ভীতি ও নেতিবাচক চিন্তা বা নেতিবাচক কথার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে আমার মন ও মস্তিষ্ক পুরোপুরি মুক্ত থাকছে। ইতিবাচক চিন্তা আমার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনছে। আমি যা চাই ইতিবাচক চিন্তা দিয়ে তা পাবো। প্রতিদিন আমি সবদিক দিয়ে ভালো হচ্ছি, লাভবান হচ্ছি, সফল হচ্ছি।'

অটোসাজেশনের ক্ষেত্রে আপনি আপনার মনোদৈহিক বা পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন অনুসারে যেকোনো ইতিবাচক কথা সংযোজন করতে পারেন। আপনার উচ্চারিত প্রতিটি অক্ষরই তখন শক্তিতে পরিণত হবে।

১৫. এরপর আপনি সময় নিয়ে মনছবি বা অন্যান্য যা করার প্রয়োজন তা করতে পারেন।

১৬. এবার জেগে ওঠার পালা। আপনি এবার মনের বাড়ি থেকে বাস্তবে ফিরে আসবেন। প্রথমে লম্বা দম নিন। মনে মনে বা আওয়াজ করে বলুন, '০ থেকে ৭ গুণে আমি চোখ মেলে তাকাবো, আমি পুরোপুরি জেগে উঠবো, পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে উঠবো।' এবার গণনা শুরু করুন। ০, ১। অনুভব করুন উড়ে যাওয়া বালুকণাগুলো চারপাশ থেকে এসে আপনার শরীর গঠন করছে। ২, ৩। লম্বা দম নিন। অনুভব করুন বালুকণাগুলো প্রাণবন্ত জৈবকোষে পরিণত হয়েছে। ৪, ৫। আবার লম্বা দম নিন। মনে মনে বলুন, '৭ গুণে আমি চোখ মেলে তাকাবো, আমি পুরোপুরি জেগে উঠবো, আমার মাথা, ঘাড়, কাঁধ বা শরীরে কোনো ব্যথা বা অস্বস্তি থাকবে না। পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ, সবল ও চাঙ্গা অনুভব করবো।' ৬, ৭। এবার চোখ মেলুন। মাথা ও ঘাড় নাড়ুন। পা টান টান করুন। হাত নাড়ুন। আস্তে আস্তে উঠে বসুন বা দাঁড়ান। জোরে আওয়াজ করে বলুন, 'বেশ ভালো লাগছে। বেশ বেশ ভালো লাগছে।'

শিথিলায়নের ১৬ ধাপ

অনুশীলনীর পর্যায়ক্রম যাতে মনে রাখতে পারেন সেজন্যে শিথিলায়নের ১৬টি ধাপের সার-সংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো :

১. পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতি।
২. আরামে বসা বা শোয়া।
৩. চোখ বোজা
৪. বিশেষ পদ্ধতিতে নাক দিয়ে দম নেয়া ও মুখ দিয়ে ছাড়া।

৫. মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে শরীরের পেশিগুলো শিথিল করা।

৬. ধীর লয়ে দম নেয়া ও দম ছাড়া।

৭. দম অবলোকন করা।

৮. শরীর ভারী লাগতে লাগতে জড় পদার্থে পরিণত হওয়া।

৯. বালুকণার স্তূপে পরিণত হওয়া।

১০. ঠান্ডা ঝড়ে বালুর স্তূপ উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে আলফা স্টেশনে পৌঁছা।

১১. মনের বাড়িতে পৌঁছার জন্যে ১৯ থেকে ০ কাউন্টডাউন করা।

১২. মনের বাড়ির পারিপার্শ্বিকতায় হারিয়ে আনন্দ উপভোগ করা।

১৩. মনের বাড়ির ড্রইংরুমে আরাম করে বসা।

১৪. দরবার কক্ষে আত্ম উন্নয়নের জন্যে অটোসাজেশন দেয়া।

১৫. দরবার কক্ষে বসে মনছবি করা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভাবনা ভাবা।

১৬. ০ থেকে ৭ গুণে জেগে উঠে পরিপূর্ণ সুস্থ ও চাঙ্গা অনুভব করা।

এই পদ্ধতিতে শিথিলায়ন করার পর প্রথমদিকে আপনার মধ্যে কিছুক্ষণ একটু আড়ষ্টভাব থাকতে পারে। তাই দ্রুত হাত পা নাড়াচাড়া করতে যাবেন না। তাহলে পেশিতে টান পড়া বা খিঁচুনি লাগতে পারে। অবশ্য আপনার বেশ আরাম লাগবে। একটা তরতাজা অনুভূতি পাবেন। রাতে ঘুমানোর আগে শিথিলায়ন করতে গেলে নিজের অজান্তেই হয়তো নাক ডাকা শুরু হয়ে যেতে পারে আপনার।

যারা অনিদ্রায় ভোগেন তারা রাতে শোয়ার আগে শিথিলায়ন করতে পারেন, ঘুমের ট্যাবলেট ছাড়াই প্রফুল্লচিত্তে ঘুমিয়ে পড়বেন। কেউ কেউ আবার অন্য সময়েও এই শিথিলায়ন করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। ঘুম ঘুম ভাব এলে অনুশীলনীর যতটুকু করার পর ঘুম এসেছিলো, সেখান থেকে আবার শুরু করুন। আর শুয়ে করতে গেলেই যদি ঘুম চলে আসতে চায় তাহলে চেয়ারে বসে বা মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে আরাম করে বসে শিথিলায়ন করুন।

কেউ কেউ এই শিথিলায়ন করতে গিয়ে বসে বসেও ঝিমাতে পারেন, মুহূর্তে তন্দ্রায় চলে যেতে পারেন, তাদের সচেতন প্রচেষ্টায় ঘুম এড়িয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, আপনি ঘুমের অনুশীলন করছেন না, আপনি শিথিলায়ন করছেন দেহ-মনকে শিথিল ও প্রশান্ত করার জন্যে। ঘুমিয়ে পড়লে আরাম পাবেন ঠিকই কিন্তু শিথিলায়নের আসল উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হবেন, সেইসাথে টেনশনমুক্তি হবে বিলম্বিত।

নিয়মিত শিথিলায়ন করে গেলে আপনার শরীর মন আপনার সংকেতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেবে (Condition reflex response)। একসময় দেখবেন শিথিল হওয়ার জন্যে এত লম্বা নিয়ম পালন করার প্রয়োজনই হচ্ছে না। শুধু চোখ বন্ধ করে কয়েকবার লম্বা দম নিয়ে এবং দুই/ এক মিনিট দম অবলোকন করে 'আরাম' 'আরাম' 'আরাম' উচ্চারণের সাথে সাথে আপনার দেহ-মনের সকল অপ্রয়োজনীয় তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে, আপনি পরিপূর্ণরূপে শিথিল হয়ে যাবেন, তারপর ১৯ থেকে ০ গণনার সাথে সাথে মনের গভীর স্তরে মনের বাড়িতে পৌঁছে যাবেন। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার শরীর মন এই সংকেতের সাথে সম্পৃক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ ধৈর্য ধরে প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করে শিথিলায়ন করে যান।

মন ও মস্তিষ্কের নিরাময় শক্তিকে কাজে লাগানোর পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলোকে ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করার জন্যে আপনাকে প্রথম এই শিথিলায়ন রপ্ত করতে হবে। এজন্যে নিয়মিত দিনে দুবার করে ৪০ দিন চর্চার কর্মসূচি নিন। কারণ মেডিটেটিভ লেভেলে পৌঁছতে পারলেই এর পরবর্তী টেকনিকগুলো সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করতে পারবেন আপনি।

গবেষণায় দেখা গেছে, নিজে নিজে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে যেকোনো বয়সের একজন মানুষ শিথিলায়ন করতে পারেন। কেউ ১০/১৫ দিনের মধ্যেই শিথিলায়ন রপ্ত করে ফেলতে পারেন, কারো হয়তো বা নিজে নিজে রপ্ত করতে নিয়মিত দু-তিন মাস চর্চার প্রয়োজন হতে পারে।

এই শিথিলায়ন চর্চা আপনার জন্যে আরো সহজ হতে পারে যদি আপনি কোয়ান্টাম মেথডের শিথিলায়ন অডিও ক্যাসেট/ সিডি ব্যবহার করেন। এটি শুনতে শুনতে আপনার শরীর মন এমনিই শিথিল হয়ে যাবে।

স্মরণ রাখুন

এ বইটি থেকে সব ধাপ মুখস্থ করে অথবা অডিও শুনে শিথিলায়ন করুন। এখানে আপনাকে যা বলা হচ্ছে তা শুধু কল্পনা করে যাবেন। যেরকম বলা হচ্ছে ঠিক সেরকম অবলোকন বা অনুভব করতে পারলেন কি পারলেন না, তা নিয়ে ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনাকে যেভাবে অবলোকন বা অনুভব করতে বলা হয়েছে, আপনি ভাববেন বা কল্পনা করবেন যে, আপনি তেমনই অনুভব করছেন। তাহলেই চমৎকার শিথিলায়ন হবে।

প্রথমদিকের মেডিটেশনের অনুভূতি

১. মেডিটেশন শেষে মনে হতে পারে আপনি শুধুমাত্র চোখ বন্ধ করে বসে বা শুয়ে ছিলেন। আর কিছুই অনুভব করেন নি। এমন হলেও চিন্তার কিছু নেই। নিয়মিত করে যান। ধীরে ধীরে অনুভূতি আসতে থাকবে।

২. কারো শরীর বেশ ভারী লাগতে পারে। এটা শুভ লক্ষণ। আপনার শরীর খুব দ্রুত আপনার কথা শুনতে শুরু করেছে।

৩. কারো গরম লাগতে বা শরীর ঘেমে যেতে পারে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কয়েকদিন চর্চা করলেই এটি স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

৪. কারো মুখে বেশ লালা আসতে পারে। এটাও শুভ লক্ষণ। শরীর প্রথমেই বেশি শিথিল হচ্ছে।

৫. কারো গলা শুকিয়ে যেতে পারে। এমন হলে মনের বাড়িতে থেকেই তেঁতুল বা লেবুর কথা একটু ভাবলেই লালা এসে গলা ভিজিয়ে দেবে।

৬. বসে শিথিলায়ন করলে প্রথম প্রথম প্রায় সবারই ঘাড়ে, কাঁধে বা পিঠে একটু ব্যথা করে। কয়েকদিন নিয়মিত চর্চা করলে তা এমনিই দূর হয়ে যায়।

৭. শিথিলায়নকালে দু-একজনের মাথা ঘোরা ও বমি বমি ভাব হতে পারে। এমন হলে শিথিলায়নরত অবস্থায়ই লম্বা করে দুই/ তিন বার নাক দিয়ে দম নিয়ে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম ছাড়ুন। দেখবেন, বমি বমি ভাব বা মাথা ঘোরা ভাব চলে গেছে।

৩

করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা ॥ এর ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতা

পুঁজিবাদের আগ্রাসনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এখন পাল্টে গেছে। অধিকাংশ মানুষের চিন্তা এখন একটাই–অর্থের পেছনে ছোটো আর টাকা কামাও। শুধু ছোটো আর ছোটো। সম্পদ আর ভোগের পেছনে এভাবে দৌড়াতে গিয়ে মানুষ সবচেয়ে বেশি অবিচার করে তার স্বাস্থ্যের ওপর।

জীবনের একটা পর্যায়ে পৌঁছে শরীর যখন বেঁকে বসে, তখন আর কিছুই করার থাকে না। একদিন যে সম্পদের পেছনে লাগামহীন ছুটতে গিয়ে সে নিজের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েছিলো, সেই হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর চিকিৎসাতেই ব্যয় হয়ে যায় তার বহু কষ্টে অর্জিত অর্থ-সম্পদ। হৃদরোগের বেলায়ও কথাটি একই রকম সত্য।

এ অধ্যায়ে আমরা করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের উপায়, এ রোগের প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতি ও এর সীমাবদ্ধতাগুলো জানতে চেষ্টা করবো।

করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের উপায়

কিছু শারীরিক উপসর্গ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ সহজেই নির্ণয় করা যায়। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কিছু আছে সহজলভ্য ও স্বল্প ব্যয়ে করা যায়। আবার কিছু আছে বেশ ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ।

সহজলভ্য এবং তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়ে করা যায় :

- ☐ ইসিজি (ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম)
- ☐ কার্ডিয়াক এনজাইম্‌স (যেমন : ট্রপোনিন, সিকে-এমবি)
- ☐ ইটিটি (এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট)
- ☐ ইকোকার্ডিওগ্রাম

ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে :

- □ করোনারি এনজিওগ্রাম (সিএজি)
  - ◆ প্রচলিত পদ্ধতিতে এনজিওগ্রাম
  - ◆ সিটি এনজিওগ্রাম
- □ থেলিয়াম আপটেক টেস্ট বা মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন স্ক্যান।

কোন পরীক্ষাটি করা চাই, কেন?

কেউ যখন বুকে ব্যথা অনুভব করেন তখন চিকিৎসক যদি মনে করেন যে, এটি হৃদরোগজনিত ব্যথা হতে পারে তবে সর্বপ্রথম তিনি রোগীকে একটি ইসিজি করার পরামর্শ দেন। ইসিজি হলো করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের একটি প্রাথমিক পরীক্ষা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসিজিতে কিছু বৈশিষ্ট্যমূলক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা দেখে শনাক্ত করা যায় যে, রোগী করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন কি না অথবা তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কি না। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আবার ইসিজিতে কোনো পরিবর্তন পাওয়া যায় না। তখন রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে কার্ডিয়াক এনজাইম্‌স যেমন, ট্রপোনিন, সিকে-এমবি ইত্যাদির পরিমাণ দেখা হয়। রক্তে এগুলোর মাত্রাধিক্য দেখে বোঝা যায়, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কি না।

কিছু রোগী আছেন, যারা বিশ্রামের সময় বুকে কোনো ব্যথা অনুভব করেন না কিন্তু যখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন কিংবা পরিশ্রমের কাজ করেন বা জোরে হাঁটেন তখন বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তাদের ক্ষেত্রে করা হয় ইটিটি। আর হার্টের কর্মক্ষমতা বোঝার জন্যে যে পরীক্ষাটি করা হয়ে থাকে সেটি হলো ইকোকার্ডিওগ্রাম। এর মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাকের পরে কিংবা স্বাভাবিক অবস্থায়ও হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বোঝা যায়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো সহজলভ্য এবং তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়ে করা সম্ভব।

অন্যদিকে করোনারি এনজিওগ্রাম ও মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন স্ক্যান হলো অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল পরীক্ষা। করোনারি এনজিওগ্রামে রোগীর হাত কিংবা ঊরুর শিরাপথে ইনজেকশনের মাধ্যমে এক ধরনের তরল রঞ্জক পদার্থ (Dye) প্রবেশ করানো হয়, তারপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গামা ক্যামেরার মাধ্যমে দেখা হয় তার করোনারি ধমনীতে ব্লকেজের পরিমাণ কতটুকু।

এ পুরো প্রক্রিয়াটির ভিডিওচিত্র দেখে কার্ডিওলজিস্টরা অনুমানের ভিত্তিতে ব্লকেজের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। প্রচলিতভাবে এনজিওগ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি তা মূলত এটাই।

এই প্রচলিত পদ্ধতিতে এনজিওগ্রাম করার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। রক্তনালীকে ছিদ্র করে তার ভেতরে রঞ্জক পদার্থ প্রবেশ করানো হয় বলে এখান থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে, রক্তচাপ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়াও যাদের বয়স বেশি, যারা কিডনি-জটিলতায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রেও এটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তাই এসব ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়ানোর জন্যে সিটি এনজিওগ্রামের পরামর্শ দেয়া হয়। এটি তুলনামূলক ব্যয়বহুল। কিন্তু কিডনি রোগী এবং যাদের হার্ট রেট তুলনামূলক বেশি কিংবা অনিয়মিত–এসব বিচারে সিটি এনজিওগ্রামও পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত পদ্ধতি নয়।

এছাড়াও আছে থেলিয়াম আপটেক টেস্ট বা মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন স্ক্যান। হার্ট অ্যাটাকের পর হৃৎপিণ্ডের যে মাংসপেশিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার কর্মক্ষমতা কতটুকু অটুট আছে সেটি বোঝার জন্যে এই পরীক্ষাটি করা হয়। এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ।

করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা

গত কয়েক দশকের তুলনায় করোনারি হৃদরোগের অত্যাধুনিক বিভিন্ন চিকিৎসা এখন সত্যিই অনেক সহজলভ্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোনো ওষুধ বা স্বীকৃত চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি, যা দিয়ে ধমনীর ব্লকেজ পুরোপুরি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে ফেলা সম্ভব।

ওষুধ আছে নানান রকম আর ধরনের

প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় হৃদরোগীদের যেসব ওষুধ সেবন করার পরামর্শ দেয়া হয় তার মধ্যে তিন ধরনের ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ব্যথা কমানোর ওষুধ। হৃদরোগীদের পকেটে বা ব্যাগে সবসময় একটি স্প্রে জাতীয় ওষুধ (নাইট্রোগ্লিসারিন) রাখতে দেখা যায়। প্রয়োজন হলে অর্থাৎ বুকে ব্যথা বা চাপ অনুভূত হলে তারা এটি ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া ট্যাবলেট আকারেও এ ওষুধটি চিকিৎসকের পরামর্শে হৃদরোগীরা প্রতিদিন সেবন করেন। এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে–যেমন, এটি রক্তচাপ কমিয়ে দিতে পারে, কারো কারো মাথাব্যথা হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, রক্ত জমাটবদ্ধতা রোধের জন্যে এন্টি-প্লেটলেট ওষুধ। যেমন, এসপিরিন, ক্লোপিডগ্রেল। তবে এগুলোরও কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এই ওষুধগুলো পরিপাকতন্ত্রে ক্ষত তৈরি করতে পারে এবং সেখান থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

তৃতীয়ত, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর ওষুধ। যেমন, স্ট্যাটিন ও

ফাইব্রেট। দীর্ঘমেয়াদি সেবনে এ ওষুধগুলো মাংসপেশির ব্যথা ও দুর্বলতা এবং লিভারের সমস্যার কারণ হতে পারে। শুধুমাত্র এই ওষুধটির পেছনেই প্রতিমাসে একজন হৃদরোগীর খরচের পরিমাণ অনেক টাকা।

টাকা তো খরচ হচ্ছে, কিন্তু ব্লকেজের পরিমাণ কি থেমে থাকছে? তা তো হচ্ছেই না, বরং বেশিরভাগ সময়ই তা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, তখন প্রয়োজন হয় ইন্টারভেনশন ও সার্জিক্যাল চিকিৎসার। ইন্টারভেনশন হলো এনজিওপ্লাস্টি বা স্টেন্টিং (রিং পরানো) আর সার্জিক্যাল চিকিৎসা হচ্ছে বাইপাস অপারেশন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তা হলো, আপনি যদি ইতোমধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করতে থাকেন, তবে নিজেই ওষুধ বন্ধ করবেন না। এ বইয়ে বর্ণিত জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি আপনি আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ সেবন অব্যাহত রাখুন। আপনার শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখে চিকিৎসকই সিদ্ধান্ত নেবেন–কখন কোন ওষুধটি বন্ধ করা প্রয়োজন।

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস : কোনটি কখন?

প্রাথমিকভাবে এনজিওগ্রাম করে ধমনীতে ব্লকেজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। তারপর রোগীর শারীরিক অবস্থা ও ব্লকেজের পরিমাণ অনুসারে এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এনজিওপ্লাস্টি হচ্ছে ধমনীর যে অংশে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজ ও রক্ত চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, সে জায়গাটিকে প্রসারিত করার একটি পদ্ধতি।

এনজিওপ্লাস্টি মূলত দুধরনের। একটি হচ্ছে বেলুনিং অর্থাৎ ধমনীর যে জায়গায় ব্লকেজ রয়েছে সেখানটায় ক্যাথেটারের (লম্বা সরু তার বিশেষ) সাহায্যে একটি বেলুন প্রবেশ করানো হয়, তারপর সে বেলুনটিকে ফুলিয়ে দিয়ে সেই জায়গাটিকে প্রসারিত করা হয়। অবশ্য ইদানীং এটি খুব কমই করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়টি এবং বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় যে পদ্ধতিটি, সেটি হচ্ছে স্টেন্টিং বা রিং পরানো। এ পদ্ধতিতে আগের মতোই ক্যাথেটারের সাহায্যে বেলুন ঢুকিয়ে ধমনীর সংকুচিত অংশটিকে প্রসারিত করা হয়। তারপর সেখানে একটি স্টেন্ট বা ধাতব রিং (বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মিত) প্রবেশ করিয়ে সেটি ওখানে স্থাপন করা হয়, যাতে তা ধমনীকে প্রসারিত করে রাখার মাধ্যমে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহে সহায়তা করে।

কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ধমনীর যে জায়গায় রিং পরানো হয়–পরবর্তীতে কখনো কখনো ঠিক সেখানেই পুনরায় ব্লকেজ তৈরি হতে পারে (Re-stenosis)। এর প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, যদি সে রিং-এর গায়ে কিছু ওষুধ লাগিয়ে দেয়া যায় তবে এই পুনঃব্লকেজ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এটাই মেডিকেটেড স্টেন্ট। অর্থাৎ রিং দুধরনের : মেডিকেটেড এবং নন-মেডিকেটেড। স্বাভাবিকভাবেই এ দুয়ের দামও ভিন্ন।

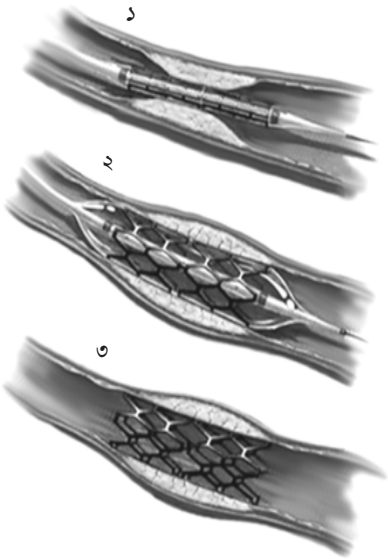

করোনারি ধমনীর অভ্যন্তরে ব্লকেজের স্থানে ধাপে ধাপে স্টেন্ট বা রিং লাগানো হচ্ছে :

১. *সরু ক্যাথেটারের মাধ্যমে ধমনীর ভেতরে স্টেন্ট প্রবেশ করানো হয়েছে*
২. *স্টেন্ট প্রসারিত করা হলো*
৩. *স্টেন্টটি জায়গামতো স্থাপন করে ক্যাথেটার বের করে নিয়ে আসা হলো*

এখন প্রশ্ন, স্টেন্টিং কাদের করা হয়? এটি করা হয় সাধারণত যাদের একটি করোনারি ধমনীতে ব্লকেজের পরিমাণ ৭০-৮০% কিংবা যাদের দুটি করোনারি ধমনীতে ৫০-৬০% ব্লকেজ এবং একটিতে ৮০% ব্লকেজ, তাদের শুধু ৮০% ব্লক্ড ধমনীতেই স্টেন্টিং করা হয়। এছাড়া যাদের বাইপাস সার্জারি করা হয়েছে কিন্তু সেই বাইপাস-রক্তনালীর ভেতরেই আবার ব্লকেজ তৈরি হয়েছে সেটিকে প্রসারিত করার জন্যেও স্টেন্টিং করা হয়ে থাকে।

স্টেন্টিং করার পরও যাদের পুনরায় ব্লকেজ হচ্ছে কিংবা যেসব রোগীর স্টেন্টিং করা সম্ভব নয়, তাদের পরামর্শ দেয়া হয় বাইপাস অপারেশনের। অর্থাৎ যাদের ব্লকেজের পরিমাণ বেশি–দুটো করোনারি ধমনীতেই একাধিক ব্লকেজ কিংবা যেকোনো একটি ধমনী থাকে পুরোপুরি বন্ধ। বাইপাস অপারেশনে ধমনীর ব্লকেজের স্থানটিতে কিছুই করা হয় না, বরং শরীরের অন্যত্র থেকে একটি রক্তনালী নিয়ে হৃৎপিণ্ডের দুই প্রান্তে লাগিয়ে দেয়া হয়। যার মাধ্যমে বিকল্প পথে রক্ত হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়।

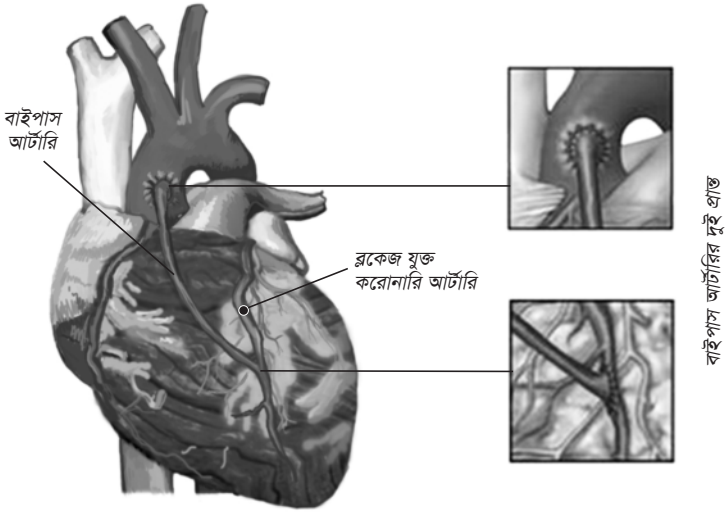

বাইপাস সার্জারি বা করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং (CABG)

ঝুঁকিমুক্ত নয় কোনোটিই

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস এখন বেশ প্রচলিত হয়ে উঠলেও, এগুলোর সার্বিক প্রক্রিয়াটি কিন্তু আসলে তত সহজ নয়। বরং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এদের কিছু তাৎক্ষণিক ঝুঁকি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সুদূরপ্রসারী ঝুঁকিও।

তাৎক্ষণিক ঝুঁকিগুলো কী কী?

প্রথমত, স্টেন্টিং করার সময় শতকরা দুই ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, যে রক্তনালীর মধ্য দিয়ে ক্যাথেটার ঢোকানো হয় সেখান থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে। ফলে আকস্মিকভাবে রক্তচাপ বেশ কমে যেতে পারে। সবচেয়ে বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে পারে–যদি বেলুন ছিঁড়ে যায় কিংবা স্টেন্ট হঠাৎ চুপ্‌সে যায় (Sudden stent closure)। এক্ষেত্রে রক্ত চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়ে রোগী হার্ট অ্যাটাকের শিকার হতে পারেন। এমন ঘটনা একেবারে দুর্লভ নয়।

এনজিওপ্লাস্টির কিছু দূরপ্রসারী ঝুঁকিও রয়েছে। যেমন, ধমনী-পথে রক্ত চলাচলের সময় রক্তকণিকাগুলো স্টেন্ট লাগানো অংশটিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এবং ধীরে ধীরে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধতে থাকে। সেই জমাটবদ্ধ রক্ত (Blood clot) কখনো কখনো ছুটে গিয়ে অন্য কোনো রক্তনালীকে ব্লক করে দিতে পারে। এভাবে মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালী আক্রান্ত হয়ে ঘটে যেতে পারে স্ট্রোকের মতো দুর্ঘটনা।

এছাড়াও এনজিওপ্লাস্টি করার তিন মাসের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ রোগী ধমনীতে পুনরায় ব্লকেজ-এ আক্রান্ত হন। গবেষণায় দেখা গেছে, দুই বছরের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ রোগীর আবার স্টেন্টিং অথবা বাইপাসের প্রয়োজন পড়ে। আর বাইপাস অপারেশনের ঝুঁকি তো স্বাভাবিকভাবেই এনজিওপ্লাস্টির চেয়ে অনেক বেশি। বুকের পাজর কেটে, কৃত্রিম মেশিনের সাহায্যে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস কয়েক ঘণ্টা সচল রেখে অপারেশন করা হচ্ছে–এটুকু চিন্তা করতেই শতকরা প্রায় দুই ভাগ রোগী অপারেশন টেবিলেই হার্ট অ্যাটাক করে বসেন।

এছাড়াও অপারেশনের ক্ষতস্থানে দীর্ঘমেয়াদি ইনফেকশন হতে পারে। আর এসব রোগীর একটা বড় অংশই এক বছরের মধ্যে আবার বুকে ব্যথা অনুভব করে থাকেন। এবং পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে তাদের সেই বিকল্প ধমনীতেও ব্লকেজ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা যেটি ঘটে তা হলো, যাদের বাইপাস অপারেশন হয়েছে তারা প্রতি পদক্ষেপে চিন্তা করতে থাকেন যে, এই বুঝি আমার হার্টের কোনো ক্ষতি হয়ে গেল। এভাবে তিনি প্রায় সারাক্ষণই এক অজানা আতঙ্কে তটস্থ থাকেন।

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস ॥ ব্যয়বহুল কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সমাধান নেই কোনোটিতেই

সবদিক বিবেচনায় এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি কোনোটিই করোনারি হৃদরোগের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা নয়। বলা যেতে পারে, রোগীকে এসব চিকিৎসার পরামর্শ দেয়া হয় বটে, কিন্তু এগুলো নেহাতই হৃদরোগের উপসর্গ দূর করার তাৎক্ষণিক উপায় বৈ আর কিছু নয় (Symptomatic treatment)। উপরন্তু এসব চিকিৎসাপদ্ধতি যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি ব্যয়বহুল।

আমরা যদি দেখি, এ চিকিৎসাপদ্ধতি কতটা ব্যয়বহুল? দেশের যেকোনো একটি বেসরকারি হৃদরোগ হাসপাতালে একটি বেলুনিং করার জন্যে খরচ হয় প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। স্টেন্টিং-এর ক্ষেত্রে প্রতিটি মেডিকেটেড রিং-এর মূল্য ৮০ হাজার থেকে দুই লক্ষ টাকা, নন-মেডিকেটেড রিং-এর মূল্য ৫০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা। এভাবে দুটি বা তিনটি রিং-এর জন্যে স্বাভাবিকভাবেই খরচ হয় দ্বিগুণ বা তিনগুণ পরিমাণ অর্থ। আর বাইপাস সার্জারির জন্যে খরচ হয় প্রায় দুই থেকে তিন লক্ষ টাকা। এছাড়াও অপারেশন-পরবর্তী কোনো জটিলতা দেখা দিলে খরচ আরো বাড়ে।

এ তো গেল শুধুমাত্র ইন্টারভেনশনের খরচ। এছাড়া বাড়তি ওষুধপত্র আর হাসপাতালে থাকার খরচ তো আছেই। আর সামর্থ্য আছে যাদের,

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা মনে করেন, এত টাকা যখন খরচ হবেই তবে আর দেশে কেন, সিঙ্গাপুর বা ব্যাংককেই যাই, নিদেনপক্ষে পাশের দেশ ভারত তো আছেই। সেখানে যে খরচ আরো বেশি সেটা বলাই বাহুল্য।

এখন প্রশ্ন হলো, এমন ব্যয়বহুল আর ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসাব্যবস্থা কি আসলেই একজন হৃদরোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ কিংবা কমবেশি আগের মতোই পূর্ণ কর্মক্ষম করে তুলতে পারছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু এর উত্তরটি হলো 'না'। কারণ মূল সমস্যার সমাধান না করে সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে গেলে যা হয়, এখানেও তা-ই ঘটে।

খোদ পাশ্চাত্যেই গবেষণায় দেখা গেছে, চিকিৎসার পর রোগীকে করোনারি ব্লকেজের কারণ ও পুনঃব্লকেজ প্রতিরোধের ব্যাপারে খুব ভালোভাবে সচেতন করা হয় না। ফলে বেশিরভাগ রোগীই স্টেন্টিং কিংবা অপারেশনের পর তার পুরনো জীবন-অভ্যাসে ফিরে যান এবং আবারও আক্রান্ত হন ব্লকেজসহ হৃদযন্ত্রের নানা জটিলতায়। ফলে যে ধমনীতে স্টেন্টিং করা হয়েছে সেটিতে বা বাইপাস করা ধমনীতেই আবার ব্লকেজ দেখা দেয় এবং বছর কয়েকের মধ্যেই রোগী আবার বুকের ব্যথা নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। এছাড়াও করোনারি হৃদরোগের ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা একটি অন্যতম প্রধান অনুঘটক, যার কোনো সমাধান হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় নেই। আর ওষুধ, এনজিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস সার্জারি–এর কোনোটি দিয়েই পুনঃব্লকেজ প্রতিরোধ করা যায় না।

কেন? এর কারণ কী? এমন ব্যয়বহুল স্টেন্টিং, বাইপাস অপারেশন আর রক্তের কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধও কেন এই ব্লকেজ তৈরির প্রক্রিয়া বন্ধ করতে পারছে না? উত্তর একটাই–যেসব কারণে হৃদরোগের সূত্রপাত সেদিকে প্রয়োজনীয় মনোযোগটি কেউ দিচ্ছেন না। না চিকিৎসক, না রোগী, না রোগীর আত্মীয়–কেউই না।

বাইপাস অপারেশনের মতো এখানেও মূল সমস্যাটিকেই বার বার বাইপাস করা হচ্ছে। যেমন, টাইফয়েড ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু বা যেকোনো ইনফেকশনের কারণে জ্বর হতে পারে। এক্ষেত্রে জ্বরটা কিন্তু রোগ নয়, রোগের একটি উপসর্গ মাত্র। প্যারাসিটামল খাইয়ে রোগীর জ্বর কমানো হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু জ্বর কী কারণে হয়েছে, সেটি নির্ণয় না করে জ্বরের যতরকম চিকিৎসাই করা হোক, রোগী কখনোই পুরোপুরি সেরে উঠবে না। হৃদরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মূলত এ ব্যাপারটিই ঘটছে। ফলে যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে। হৃদরোগীরা ঘুরেফিরে একই রোগচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কী বলে?

করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি যে দীর্ঘমেয়াদি কোনো সমাধান নয়, বরং নেহাতই একটি তাৎক্ষণিক উপশমের মাধ্যম, সেটি নিয়ে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, খোদ মেডিকেল সায়েন্সের বইতেই এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

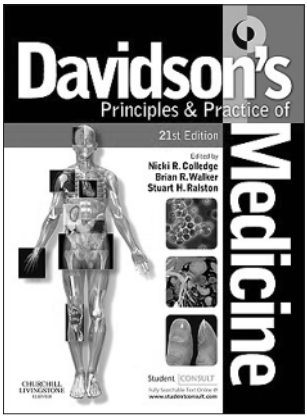

মেডিকেল ছাত্র ও চিকিৎসকদের সর্বাধিক পঠিত টেক্সটবুক 'Davidson's Principles & Practice of Medicine'-এর সর্বশেষ সংস্করণে Cardiovascular disease অধ্যায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে–'PCI (coronary angioplasty & CABG) provides an effective symptomatic treatment but there is no evidence that it improves survival in patients with chronic stable angina.' (Page-586)

অর্থাৎ করোনারি এনজিওপ্লাস্টি এবং বাইপাস সার্জারি এ রোগের সাময়িক উপশম করে, কিন্তু যারা সবসময় বুকের ব্যথায় ভুগছেন এটি তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটায়–এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

'PCI is more effective than medical therapy for alleviating angina pectoris and improving exercise tolerance but does not reduce mortality. It carries risk of procedure related MI, emergency CABG and repeat procedures for restenosis.' (Page-587)

অর্থাৎ এক্ষেত্রে ওষুধ সেবন করে যে উপশমটুকু হয় সে তুলনায় এসব চিকিৎসাপদ্ধতি হয়তো কিছুটা ব্যথা উপশম করে বটে, কিন্তু এটা মৃত্যুঝুঁকি কমাতে পারে না। বরং এতে হার্ট অ্যাটাক, জরুরি ভিত্তিতে বাইপাস এবং পুনঃব্লকেজের ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়।

এ থেকে বোঝা যায় যে, করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থা কেবল সাময়িক উপশম করে মাত্র। সেইসাথে এটি ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল।

জানা চাই আপনার হৃদরোগের কারণ

আমরা জেনেছি, ধূমপান, ভুল খাদ্যাভ্যাস, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস, শারীরিক পরিশ্রমহীন জীবনযাপন, মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল এবং সর্বোপরি স্ট্রেস ইত্যাদি কারণে করোনারি হৃদরোগ হতে পারে। একেকজনের ক্ষেত্রে এর এক বা একাধিক কারণ থাকতে পারে।

পূর্ণ নিরাময় তখনই সম্ভব, যখন একজন হৃদরোগী জানবেন–কী তার হৃদরোগের কারণ, কোন ঝুঁকিপূর্ণ অভ্যাস বা জীবনাচার তার হৃদযন্ত্রকে অসুস্থ করে তুলছে। যেকোনো সমস্যার ক্ষেত্রে কারণটি শনাক্ত করতে পারলে অর্থাৎ সমস্যাটি বুঝতে পারলে সমাধান তখন হয়ে ওঠে সময়ের ব্যাপার। আপনার করোনারি হৃদরোগের কারণগুলো শনাক্ত করতে পারলেই আপনিও ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবেন সুস্থতার পথে।

আসুন, নিজের হৃদয়ের দিকে তাকাই

চারপাশের সবার দিকে আমরা তাকাই। অন্যের দোষ গুণ ভুল ত্রুটি ভালো মন্দ ইত্যাদি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। আমাদের চোখ সবাইকেই দেখে, দেখে না কেবল নিজেকে। আমাদের মনের চোখও অনেকটা তা-ই। কিন্তু নিজের সমস্যা বুঝতে হলে, সমস্যার ধরন জানতে হলে, সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপ দিতে চাইলে, সর্বোপরি ভেতরের অফুরন্ত আত্মশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে নিরাময় ও সুস্থতার পথে এগিয়ে যেতে চাইলে প্রয়োজন নিজের দিকে ফিরে দেখা, নিজের গভীরে তাকানো।

এই আত্মনিমগ্নতা খুব সহজেই আমাদের সমস্যা এবং সম্ভাবনার পথ নির্দেশ করে। আমাদের ভুল আর করণীয় ও বর্জনীয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি আমরা। আর এটি সম্ভব মেডিটেশনে।

'হৃদয়ের কথা বলি হৃদয়ে' মেডিটেশনে আপনি জীবনে প্রথমবারের মতো আপনার হৃৎপিণ্ডের সাথে কথা বলবেন। তার প্রতি মনোযোগ দেবেন। শুনবেন, কী বলতে চায় সে। আপনার হৃৎপিণ্ডের কাছে জানতে চাইবেন–তার কষ্টের কারণ, কী কারণে সে কাঁদছে, আপনার কোন কোন ভুল জীবনাচার দিনের পর দিন তাকে অসুস্থ করে তুলেছে? গভীর আত্মনিমগ্নতায় আপনি শুনবেন তার উত্তর, তার কষ্টের কারণগুলোকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবেন। এই মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে আপনি জীবনে প্রথমবার আপনার হৃদযন্ত্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করবেন।

আসুন, আমরা মেডিটেশনে প্রবেশ করি।

মেডিটেশন ॥ হৃদয়ের কথা বলি হৃদয়ে

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির দরবার কক্ষে গিয়ে বসুন।

২. ৩ থেকে ০ গণনা করে দরবার কক্ষের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করুন নিরাময় কক্ষে। ৩-২-১-০। আপনি পৌঁছে গেছেন নিরাময় কক্ষে।

আপনার চেয়ারে আরাম করে বসুন। অবলোকন করুন হালকা নীল আলোয় প্লাবিত হচ্ছে আপনার পুরো অস্তিত্ব .....

প্রিয় সুহৃদ, আপনি জানেন, হৃদরোগ শুধু হৃৎপিণ্ডের রোগ নয়। হৃদরোগের আসল উৎস হলো হৃদয়। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মমতার অভাব, প্রিয়জনের সাথে সম্পর্কের জটিলতা, পেশাগত স্ট্রেস বা মানসিক চাপের প্রভাব পড়ে আমাদের মনের ওপর। পরবর্তীতে যা আমাদের হার্টের স্বাভাবিক কর্মছন্দকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। তাই সুস্থ স্বাভাবিক হার্টের জন্যে মন থেকে এসব নেতিবাচক আবেগ ঝেড়ে ফেলতে হবে।

৩. এবার আপনার হার্টকে অবলোকন করুন। হার্টে কান লাগান। হার্টের কথা শুনুন। হার্টের সাথে কথা বলুন .....

অনুভব করুন হৃদযন্ত্র বা হার্ট আপনার দেহের কত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। সারা শরীর থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডযুক্ত দূষিত রক্ত হার্টে এসে জমা হচ্ছে, হার্ট সেই রক্ত ফুসফুসে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আবার ফুসফুস থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত হার্টে আসার পর হার্ট পাম্প করে সেই রক্ত শরীরের প্রতিটি কোষে পাঠিয়ে দিচ্ছে .....

অনুভব করুন জন্মগ্রহণ করার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও না থেমে প্রতিনিয়ত এ কাজ করছে আপনার হার্ট .....

৪. হার্টকে আপনার পরম বন্ধু হিসেবে অনুভব করুন। আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে হার্টের নিরলস পরিশ্রমকে অনুভব করুন। জীবনব্যাপী এ অক্লান্ত কাজের জন্যে গভীর কৃতজ্ঞতা জানান তাকে। আপনার হার্টের জন্যে অনুভব করুন গভীর মমতা .....

অবলোকন করুন হার্ট আপনার শরীরের একটি অঙ্গ শুধু নয়; আপনার সেবায় নিয়োজিত এক জীবন্ত অস্তিত্ব, আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু। এ বন্ধুর সাথে এখন সরাসরি কথা বলবেন আপনি .....

প্রিয় বন্ধুর সাথে দীর্ঘদিন পর যোগাযোগ হওয়ায় আনন্দানুভূতি নিয়ে হার্টকে ডাকুন। সম্বোধন করুন কোনো মিষ্টি, শ্রুতিমধুর নামে।

দেখুন, সে আপনার সম্বোধনের কী উত্তর দিচ্ছে। উত্তর শুনতে কান পাতুন আপনার হার্টে। বুঝতে চেষ্টা করুন তার উত্তর।

তার কণ্ঠের উষ্ণতাকে অনুভব করুন।

আপনার শরীরের একটি মাংসপিণ্ড হিসেবে নয়, হৃদযন্ত্রকে অনুভব করুন অনুভূতিময় একটি অস্তিত্ব হিসেবে যা আপনার আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ সব অনুভূতিতেই সাড়া দেয় ও প্রভাবিত হয়।

হার্টকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার জীবনে তার ভূমিকা কী?

উত্তরে সে কী বলছে? .....

বুঝতে চেষ্টা করুন হার্টের উত্তর। সে বলছে, আপনাকে বাঁচিয়ে রাখাই তার কাজ। আপনি যাতে জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন সে জন্যেই সে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

অনুভব করুন হার্ট আপনাকে বলছে, আমি তোমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু।

৫. হার্টকে জিজ্ঞেস করুন, আপনাকে সে কীভাবে সাহায্য করছে?

শুনুন তার উত্তর–'তুমি কখনো প্রচণ্ড হতাশায়, দুঃখে, যন্ত্রণায় মুষড়ে পড়েছিলে। কখনো রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলে। কখনো নিঃসঙ্গতায়, কখনো না পাওয়ার বেদনায়, কখনো বা লজ্জা-সংকোচ-হীনম্মন্যতায় অসহায় হয়ে পড়েছিলে। এসব পরিস্থিতি আমার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। তবুও আমি কখনো থেমে থাকি নি। প্রতিটি মুহূর্তে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে কাজ করে গেছি .....

আপনার হার্ট তার জমানো কষ্টগুলো, আকুলতাগুলো ধীরে ধীরে আপনাকে বলে যাচ্ছে। আপনি অনুভব করছেন দৈনন্দিন জীবনের ও দীর্ঘদিনের জমে থাকা আবেগ অনুভূতির সরাসরি প্রভাব পড়েছে আপনার হার্টের ওপর। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটাই হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

৬. আপনি দেখুন, বিশ্লেষণ করুন, আপনার হার্টের ওপর এ ধরনের আবেগ, অনুভূতির প্রভাব কতটুকু। হার্টকে রোগগ্রস্ত করে তুলতে পারে এমন কিছু কি আপনার জীবনে ঘটে চলেছে? .....

জীবনের প্রতি কি আপনি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল? নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রতি পরিপূর্ণ মমতা অনুভব করেন কি? .....

আপনি জানেন, স্নেহ-মমতাহীন জীবন এক দুঃসহ বোঝা। আর এর প্রভাবেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন আপনি।

জীবনের প্রতি কি কোনো অনীহা বোধ আছে আপনার? আপনি কি নিজেকে ভালবাসেন? নিজের প্রতি কতটুকু মমতা আছে আপনার?

হতাশা, অনুশোচনা, আশঙ্কার মতো নেতিবাচক আবেগ, হীনম্মন্যতা, ধূমপান, মাদকাসক্তি, পেশাগত চাপ, মানসিক অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা, ঋণগ্রস্ততা আপনার জীবনকে আনন্দহীন বোঝায় রূপান্তরিত করতে পারে। আবার টিভি ও মিডিয়া আসক্তি বা পরিবারের কারো সাথে ভুল বোঝাবুঝি, ক্ষোভ কিংবা দাম্পত্য কলহ জীবনের প্রতি আপনাকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে পারে।

অবলোকন করুন, এমন কোনোকিছু কি ঘটেছে আপনার জীবনে? সময় নিয়ে অনুসন্ধান করুন .....

বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে আপনার হার্টকে জিজ্ঞেস করুন। তাকে জিজ্ঞেস করুন, এসবের কোনটার ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে তার ওপর? আপনার ক্ষেত্রে হৃদরোগের এক বা একাধিক কারণ থাকতে পারে। অবলোকন করুন, হৃদরোগের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ কী আছে আপনার জীবনযাপনে? আপনি কি ধূমপায়ী? আপনি কি অতিভোজনে অভ্যস্ত? অতিরিক্ত তেল, চর্বি, মসলাযুক্ত খাবার দেখলেই কি আপনি ঝাঁপিয়ে পড়েন? আপনি কি খুব বেশি টেনশন করেন বা সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন? কিংবা আপনার কি শারীরিক পরিশ্রমে অনীহা রয়েছে? প্রতিদিন নানা অজুহাতে আপনি কি হাঁটা, ব্যায়াম করা থেকে বিরত থাকেন? অবলোকন করুন, কোন বিষয়টি বা বিষয়গুলো আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে? সময় নিয়ে ভাবুন .....।

আপনি শনাক্ত করেছেন শারীরিক অনিয়মগুলো, অনাচারগুলো।

আপনি বুঝতে পারছেন সুষম খাবার, ব্যায়াম, মেডিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুরুত্ব।

৭. এবার প্রতিজ্ঞা করুন, আপনি হার্টের যথাযথ যত্ন নেবেন।

গভীর ভালবাসায় প্লাবিত করুন হার্টকে। অনুভব করুন আপনার এই একাগ্র মনোযোগে হৃদযন্ত্র উল্লসিত হয়ে উঠেছে। হৃদয় ও হৃৎপিণ্ড একাকার হয়ে গেছে।

৮. অবলোকন করুন আপনার মমতা পেয়ে আপনার হার্ট আনন্দে নাচছে ..... নাচছে আপনার মন .....।

সারা দেহ-মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের শিহরণ অনুভব করুন .....।

অনুভব করুন এক সুস্থ হৃদযন্ত্র আপনার জীবনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু।

দিনে যখনই সময় পান, নীরবে চোখ বন্ধ করে হার্টের প্রতি মনোযোগ দিন। তার কাজকে অবলোকন করুন। হার্টের প্রতি আপনার মনোযোগ হার্টকে প্রতিদিন করে তুলবে আগের চেয়ে সুস্থ, আগের চেয়ে সবল, আগের চেয়ে প্রাণবন্ত। আপনার জীবনে আসবে নতুন ছন্দ, নতুন আনন্দ, নতুন বিশ্বাস, নতুন প্রত্যয়।

৯. এবার মনে মনে প্রত্যয়ন করুন, সুস্থ থাকার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত। সুস্থতা স্বাভাবিক আর অসুস্থতা অস্বাভাবিক। আমি প্রাকৃতিক নিয়মেই সুস্থ হচ্ছি। প্রাণবন্ত হচ্ছি, সফল হচ্ছি, সুখী হচ্ছি।

১০. ০ থেকে ৩ গণনা করে আপনি দরবার কক্ষে ফিরে আসুন। তারপর নিয়মমতো ০ থেকে ৭ গণনা করে স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

৪

নতুন আশা নতুন বিশ্বাস ॥ সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস হৃদরোগ নিরাময় করে

আমরা জেনেছি, হৃদরোগের সাথে ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি ও ভুল জীবন-অভ্যাসের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টির কারণে আমরা একদিকে যেমন জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে সরে গেছি, তেমনি সংজ্ঞায়িত করতে পারছি না আমাদের চাওয়াকে। কী চাই, কতটুকু চাই–আমরা নিজেরাই জানি না। যত পাচ্ছি তত আমাদের মধ্যে আরো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হচ্ছে এবং চাওয়া-পাওয়ার এক দুর্বিষহ চক্র অভিশপ্ত করে তুলছে আমাদের জীবনকে। ভেতরে সৃষ্টি হচ্ছে অশান্তি, অস্থিরতা, টেনশন। এছাড়াও আছে একাকিত্ববোধ ও বিষণ্নতা, যা আমাদেরকে ক্রমশ আরও স্ট্রেসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আর এই টেনশন ও স্ট্রেস আমাদের মধ্যে ক্রমাগত 'ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স' তৈরি করছে। সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম সবসময় থাকছে উদ্দীপ্ত এবং স্ট্রেস হরমোনের অতিরিক্ত নিঃসরণ ঘটছে। ফলে হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনী সংকুচিত হচ্ছে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে।

আবার, জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে আমরা শারীরিক পরিশ্রমহীন আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দিচ্ছি। সেইসাথে ফাস্টফুডসহ অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত তৈলাক্ত খাবারের কারণে শরীরে মেদ জমছে, বাড়ছে কোলেস্টেরলের মাত্রা। এই বাড়তি চর্বি বা কোলেস্টেরলই একসময় করোনারি ধমনীতে ব্লকেজ তৈরি করছে, দেখা দিচ্ছে হৃদরোগ।

এতদিন চিকিৎসকদের বিশ্বাস ছিলো, ধমনী একবার ব্লক হওয়া শুরু করলে বাইপাস সার্জারি কিংবা এনজিওপ্লাস্টি ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই। চিকিৎসকদের এ রক্ষণশীল চিন্তার মর্মমূলে প্রথম আঘাত হানেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. ডিন অরনিশ।

নিজের জীবন বদলের এক অসাধারণ ঘটনা আর সাধকদের হাজার বছরের চিরায়ত জ্ঞানের আলোকে তিনি হৃদরোগীদের নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন এবং অভূতপূর্ব ফল পান। উদ্ভাবন করেন হৃদরোগ নিরাময়ের এক কার্যকর ও সমন্বিত চিকিৎসাপদ্ধতি।

হৃদরোগ গবেষণায় নতুন দিগন্ত ॥ ডা. ডিন অরনিশের প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ

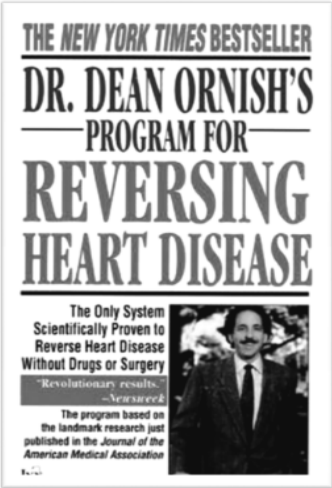

করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ে ডা. ডিন অরনিশের সফল গবেষণার আদ্যোপান্ত নিয়ে লেখা তার বেস্ট সেলার বইটি হলো 'প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ'। বইটিতে তিনি এ যুগান্তকারী গবেষণার সূত্রপাত ও এর নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।

ডিন অরনিশ তখন ছাত্র। প্রি-মেডিকেল কোর্সে পড়াশোনা করছিলেন। এ কোর্সটি ভালোভাবে শেষ করতে পারলে তবেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। সব ঠিকঠাক মতোই চলছিলো, কিন্তু বাধ সাধলো অরগানিক কেমিস্ট্রি। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টিতে ভালো করাকেই মেডিকেল কলেজে ভর্তির একমাত্র যোগ্যতা বলে মনে করতেন। এদিকে অরগানিক কেমিস্ট্রির প্রথম ক্লাসেই জাঁদরেল টিচার এসে ঘোষণা দিলেন যে, এটি হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সের আগাছা পরিষ্কার করার কোর্স এবং তোমাদের আমি আগাছা হিসেবে দূর করে দেবো।

সেই টিচার পড়াতেন কোনো টেক্সটবুক ছাড়াই, অল্প কিছু শ্রুতিধর ছাত্রছাত্রী ছাড়া অধিকাংশই তার পড়া ধরতে পারতো না। ফলে অরনিশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করলেন এবং একসময় তার মধ্যে হতাশা দেখা দিলো।

অরনিশ ভাবলেন, তার পক্ষে অরগানিক কেমিস্ট্রিতে পাশ করা সম্ভব নয়। গভীর বিষণ্নতায় ভুগতে শুরু করলেন তিনি। একটা পর্যায়ে তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি হলো। যথারীতি একদিন তিনি আত্মহননের

পরিকল্পনাও করে ফেললেন–বাড়ির কাছেই বড় রাস্তার ওপর ওভারব্রিজ, সেই ওভারব্রিজে উঠবেন, ওখান থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়বেন, কোনো গাড়ি এসে তাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু ক্রমাগত হতাশা আর বিষণ্ণতায় তিনি মানসিকভাবে এতই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, তার পক্ষে সেদিন বাড়ির বাইরে বের হওয়া তো দূরের কথা, বিছানা ছেড়ে ওঠাই সম্ভব হলো না। অরনিশ পরবর্তীতে লিখেছেন, এই ঘটনাটিও তাকে বুঝতে সাহায্য করে, মন কীভাবে শরীরকে প্রভাবিত করে।

আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাতেও ব্যর্থ হওয়ায় অরনিশ একসময় কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। পড়াশোনায় একরকম ইস্তফা দিলেন। টেক্সাসে নিজ বাড়িতে চলে গেলেন। তাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন আধ্যাত্মিক সাধক ও স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্য স্বামী সৎচিদানন্দ। অরনিশের বাবা স্বামীজীর অনুসারী ছিলেন। অরনিশকে তিনি নিয়ে গেলেন স্বামীজীর কাছে।

যোগগুরু স্বামী সৎচিদানন্দ একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী সাধক ছিলেন। তৎকালীন সময়ে তিনি আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ এবং জাতিসংঘে বক্তৃতা করেন।

স্বামীজী অরনিশকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন ধারণা দিলেন। শিথিলায়ন, মেডিটেশন, যোগ ব্যায়াম, প্রাণায়াম ও মনছবির প্রক্রিয়া শেখালেন। অরনিশ নিয়মিত স্বামীজীর কাছে যাতায়াত এবং চর্চা অব্যাহত রাখলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তার বিষণ্ণতা কেটে গেল। অরনিশ একসময় তার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন। আবার কলেজে ফিরে গেলেন এবং সাফল্যের সাথে প্রি-মেডিকেল কোর্স সম্পন্ন করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। ছাত্রজীবনের এই ঘটনা অরনিশের জীবনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। তার জীবনদৃষ্টি ও জীবনধারায় আনে এক গভীর পরিবর্তন।

পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে তিনি যখন হাসপাতালের কার্ডিওলজি ইউনিটে কাজ করতে শুরু করেন তখন হৃদরোগীদের কষ্ট তাকে ভীষণ স্পর্শ করে। তিনি দেখেন, যেসব হৃদরোগী ব্লকেজ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন তাদের এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস করা হচ্ছে এবং বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেন, এনজিওপ্লাস্টি করা হয়েছে এমন রোগীদের শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ রোগী পরবর্তী চার থেকে ছয় মাসের মধ্যেই পুনঃব্লকেজ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। যাদের বাইপাস সার্জারি করা হচ্ছে তাদের প্রায় অর্ধেকই পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছেন।

অরনিশ লক্ষ করলেন, হাসপাতালের কার্ডিওলজি ইউনিটে সকালে যে

স্ন্যাক্স দেয়া হচ্ছে সেটা হলো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, সাথে মেয়োনেজ। শুধু তা-ই নয়, হাসপাতালের লবিতে শোভা পাচ্ছে সিগারেট মেশিন। হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ায় যে খাবারগুলো পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে চিজ্‌বার্গারসহ নানারকম চর্বিজাত খাবার ও ফাস্টফুড।

অরনিশ বুঝলেন, গলদটা কোথায়। তিনি জানতেন, এর বছর কয়েক আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্যাথলজিস্ট ড. রবার্ট উইসলার একটি গবেষণা পরিচালনা করেন, যেখানে একদল বেবুনকে নিয়মিত হসপিটাল ডায়েট (হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের যেসব খাবার দেয়া হয়) খাওয়ানো হয়। কিছুদিন পর দেখা যায়, বেবুনগুলোর করোনারি ধমনীতে ব্লকেজ তৈরি হয়েছে।

পুরো বিষয়টি অরনিশের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। তিনি হৃদরোগীদের নিয়ে একটি গবেষণার সিদ্ধান্ত নিলেন। ছাত্রজীবনে অরনিশের নিজের হতাশা, ব্যর্থতা এবং তা থেকে উত্তরণের ঘটনাটি তার এ গবেষণায় ব্যাপক প্রভাব রাখে।

প্রাচ্যের বুজুর্গ-ঋষি-সাধকদের হাজার বছরের চিরায়ত শিক্ষার এক চমৎকার প্রয়োগ তিনি ঘটালেন হৃদরোগীদের জীবনে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে ডা. অরনিশ এ বিষয়টির উপযোগিতা নতুনভাবে উপস্থাপন করলেন সবার সামনে। সুস্থ জীবনের আশাবাদ ফিরে পেলেন হৃদরোগীরা।

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস ॥ বদলে দিলো হৃদরোগীদের জীবন

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ডা. ডিন অরনিশ এ ব্যাপারে নানা গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে আসছিলেন। অবশেষে ১৯৮৬ সালে ৪৮ জন হৃদরোগীকে নিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে গবেষণা শুরু করেন। এই রোগীদের কেউই বাইপাস সার্জারি করাতে রাজি ছিলেন না। এদিকে কোলেস্টেরল জমে জমে এদের করোনারি ধমনীতে রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিলো। কেউ কেউ ততদিনে হার্ট অ্যাটাকেরও শিকার হয়েছেন। এদের দুটি দলে ভাগ করলেন অরনিশ। প্রথম দলে ২৮ জন আর কন্ট্রোল গ্রুপে ২০ জন।

দুদলের মধ্যে প্রথম ২৮ জনকে নিয়ে ডিন অরনিশ নতুন কার্যক্রম হাতে নিলেন। স্বামী সৎচিদানন্দের কাছ থেকে শেখা জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার আলোকে অরনিশ এদের জীবনদৃষ্টি পরিবর্তন

করার শিক্ষা দিলেন। জীবন সম্পর্কে তাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি শুধরে দেয়ার চেষ্টা করলেন। খোলামেলা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে অরনিশ তাদের একাকিত্ব, বিষণ্নতা, দুঃখ, মানসিক চাপ ও অশান্তির কারণ খুঁজে বের করলেন এবং সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিলেন।

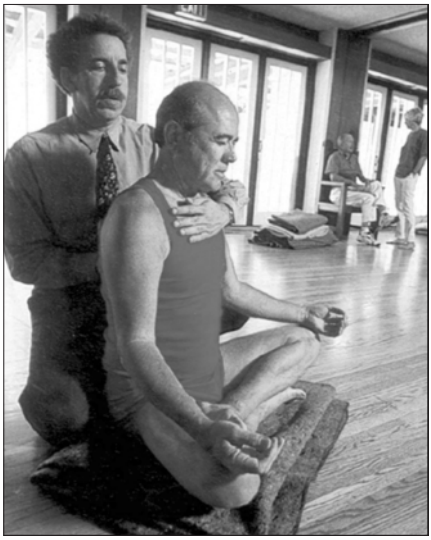

একজন হৃদরোগীকে মেডিটেশনের ভঙ্গি ঠিক করে দিচ্ছেন ডা. ডিন অরনিশ

অরনিশ তাদেরকে প্রতিদিন দুবেলা নিরাময়ের মেডিটেশন করতে শেখালেন। এর পাশাপাশি তিনি তাদের যোগ ব্যায়ামের কিছু আসন শেখালেন এবং প্রতিদিন ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা যোগ ব্যায়াম করতে বললেন। ঘণ্টায় চার মাইল বেগে প্রতিদিন ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা হাঁটার পরামর্শ দিলেন। অরনিশ তাদের তেল-চর্বিমুক্ত খাবার খেতে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং সেইমতো খাবারের তালিকা তৈরি করে দিলেন। ধূমপান বর্জনের পরামর্শ দিলেন।

এ কার্যক্রমের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ছিলো, সপ্তাহে দুবার গ্রুপ সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং সেশন, যেখানে রোগীরা তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ-পরামর্শ করতেন–হোক সেটি তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক যেকোনো সমস্যা। নিজের এমন কোনো দুঃখ হতাশা কষ্ট, যা হয়তো তিনি এতদিন কাউকে বলতে পারছিলেন না, তারা অবলীলায় অরনিশ ও অন্যান্য কাউন্সিলরদের সেসব ব্যাপার বলতে ও ভাব-বিনিময় করতে লাগলেন। প্রয়োজনে অঝোরে কেঁদে বুকটাকে হালকা করতেন হৃদরোগীরা। অন্যদিকে দ্বিতীয় দল অর্থাৎ কন্ট্রোল গ্রুপের ২০ জনকে আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশন নির্দেশিত পথ্যবিধি ও হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসার অধীনে রাখা হলো।

জীবন-অভ্যাস পরিবর্তনই আসল সমাধান

একবছর ধরে চললো গবেষণা। এ পুরো সময় ধরে দুই গ্রুপের রোগীদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হলো। একবছর পর দুদল রোগীর সবাইকে পরীক্ষা করা হলো–কোন গ্রুপে কেমন অগ্রগতি হয়েছে। পাওয়া গেল অভূতপূর্ব ফলাফল।

দেখা গেল, ডা. অরনিশের কর্মসূচি অনুসরণ করেছিলেন যারা, তাদের ধমনীতে ব্লকেজের পরিমাণ তো বাড়েই নি; বরং কমেছে। এবং হৃৎপিণ্ডের চারপাশে ছোট ছোট পরিপূরক রক্তনালিগুলো সচল হয়ে উঠেছে (ন্যাচারাল বাইপাস)। ধমনী-পথে রক্ত চলাচল সন্তোষজনকভাবে বেড়েছে। সেইসাথে রোগীরা মুক্তি পেয়েছেন ভীতিকর বুকব্যথা থেকে। ফলে তাদের হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কাও কমে এসেছে।

অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের ২০ জনের প্রায় সবারই ধমনীতে ব্লকেজের পরিমাণ বেড়েছে। তাদের শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না, বরং কারো কারো অবস্থার বেশ অবনতি ঘটলো।

জীবনধারা পরির্তনের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ থেকে মুক্তির এ যুগান্তকারী সাফল্যের কথা বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারে ১৯৮৮ সালে। সে বছরই 'জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন' এ গবেষণাটি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে।

অবশ্য এ ধরনের গবেষণা তখন একেবারে নতুনও নয়। এর আগে একেকজন চিকিৎসক আলাদা আলাদাভাবে একেকটি বিষয় নিয়ে গবেষণা-কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন, যেমন ডা. হার্বার্ট বেনসন গবেষণা চালিয়েছিলেন মেডিটেশনের প্রভাব নিয়ে, ডা. র‍্যাল্ফ পাফেনবার্গার কাজ করেছিলেন ব্যায়াম নিয়ে, ডা. ফ্র্যাঙ্ক সাক্স দেখতে চেয়েছিলেন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রভাব। প্রথমত, এ গবেষণাগুলোর কোনোটাই সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ ছিলো না। দ্বিতীয়ত, সেগুলো ছিলো উচ্চ রক্তচাপ ও অতিরিক্ত কোলেস্টেরলের রোগীদের নিয়ে, হৃদরোগীদের নিয়ে কোনোটাই নয়।

ডা. অরনিশই হৃদরোগ নিরাময়ে এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ গবেষণার সূত্রপাত করেন। তিনি হৃদরোগীদের সমন্বিত জীবনাচার পদ্ধতি পরিবর্তনে উৎসাহী করে তোলেন, যেমন : নিয়মিত মেডিটেশন, সুস্থ খাদ্যাভ্যাস, যোগ ব্যায়াম, হাঁটা, গ্রুপ-সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং। ফলে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তের গ্লুকোজ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা তো নিয়ন্ত্রণে এলোই, সাথে করোনারি ব্লকেজের পরিমাণও কমতে শুরু করলো।

নতুন আশা নতুন বিশ্বাস

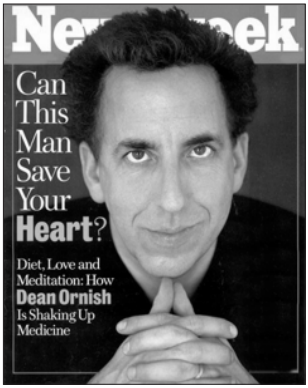

ডা. ডিন অরনিশ উদ্ভাবিত এ চিকিৎসাপদ্ধতির সাফল্যের খবর সর্বমহলেই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। এ নিয়ে বিশ্বখ্যাত সাময়িকী 'নিউজউইক' (২৪ জুলাই, ১৯৯৫) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে 'গোয়িং মেইনস্ট্রিম' নিবন্ধটি। এ গবেষণা থেকে সবার কাছে একটি বার্তা পৌঁছে যায় যে, সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবনাচার অনুসরণের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি নিরাময়ও করা যায়।

পরিসংখ্যানভিত্তিক এ গবেষণার সমস্ত তথ্য-উপাত্ত ও সাফল্যের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর ওমাহার মিউচ্যুয়াল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি স্বাস্থ্যবীমার পলিসিধারী শত শত হৃদরোগীকে অরনিশের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এদের মধ্যে ২০০ জন রোগী ১৫ হাজার ডলারের এনজিওপ্লাস্টি বা ৪০ হাজার ডলারের বাইপাস সার্জারির জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার বদলে অরনিশের পাঁচ হাজার ডলারের ঝুঁকিমুক্ত এ জীবনধারা পরিবর্তন পদ্ধতিতে অংশ নেন। বছরব্যাপী এ কর্মসূচিতে ছিলো নিয়মিত মেডিটেশন, যোগ ব্যায়াম, হাঁটা, চর্বিমুক্ত খাবার এবং কাউন্সেলিং।

২০০ জন রোগীর মধ্যে ১৯০ জন একবছরের এই কর্মসূচি অনুসরণ করেন। এর মধ্যে ১৮৯ জনই সুস্থ হয়ে ওঠেন, মাত্র একজনের অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে। এ অভাবনীয় সাফল্য দেখে আরও ১৫টি বীমা কোম্পানি অরনিশের কর্মসূচি গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়। শুধু তা-ই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পাঠানো হয় ক্যালিফোর্নিয়ার সাওসালিটোতে। তারাও এ কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ও শিখতে চান।

নেবেরেস্কার ৫০ বছর বয়সী একজন পুলিশ অফিসার ফ্রাঙ্ক সেবরন। তিনি অরনিশের কর্মসূচিতে যোগ দেন। এর আগে তার এনজিওপ্লাস্টি করা হয়েছে এবং তাকে প্রতিমাসে দুশ ডলার ব্যয় করে বেশ কয়েকটি ওষুধ খেতে হতো। শারীরিকভাবে তিনি এতটাই দুর্বল ছিলেন যে, অল্প পরিশ্রমের কোনো ছোটখাটো কাজও করতে পারতেন না।

ডা. ডিন অরনিশের একবছর মেয়াদি কার্যক্রম অনুসরণ করে তার করোনারি ধমনীতে রক্তপ্রবাহ আগের চেয়ে বাড়লো। কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমলো আগের তুলনায়। দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে তিনি এমনই উদ্যম অনুভব করছিলেন যে, বাইসাইকেলে দূরপাল্লার ভ্রমণ পর্যন্ত করতে পারছিলেন।

অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলধারায়

করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে ডা. ডিন অরনিশের এ কর্মসূচি এত ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে যে, এটি এখন আর বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতি নয়; বলা যায়, চিকিৎসার মূলধারায় এর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

এনজিওপ্লাস্টি এবং সার্জারি ছাড়া হৃদরোগ নিরাময়ের এ চিকিৎসাপদ্ধতি এখন সবচেয়ে আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। গত দুদশকে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বেই এটি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ গবেষণা ডা. অরনিশকে এমনই খ্যাতি আর গ্রহণযোগ্যতা এনে দিয়েছিলো যে, বিল ক্লিনটন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তিনি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

হৃদরোগ গবেষণায় ডা. অরনিশের সাফল্যের খবর বিশ্বজুড়ে মূলধারার পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন খ্যাতনামা জার্নালগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। বছর কয়েক আগে অরনিশ ভারতে এসেছিলেন এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স-এ ভারতীয় চিকিৎসকদের একটি কনফারেন্সে তিনি তার গবেষণার বিস্তারিত ফলাফল তুলে ধরেন। এ গবেষণার সাফল্য সে দেশের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদেরও দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তীতে ভারতেও এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং চমৎকার ফলাফল পাওয়া গেছে।

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ডা. অরনিশের গবেষণার ফলাফল এবং এ সংক্রান্ত কিছু মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

☐ Newsweek

Revolutionary Results

"**Dr. Dean Ornish's work could change the lives of millions…** At the end of the year, most patients reported that their chest pains had virtually disappeared for eighty two percent of the patients, arterial clogging had reversed. They started to feel better almost immediately, and today

they feel great. Dr. Dean Ornish's patients are thrilled with their new lives. By the standards of conventional medicine, the impossible has happened."

☐ U.S. News & World Report

".....Revolution is brewing. Until very recently, doctors believed that the ravages of heart disease, The nation's no. 1 killer, were irreversible-that by the time cholesterol deposits had so chocked the vital blood vessels feeding the heart as to bring on chest pains or heart attack, patients had no hope of ever again having a healthy heart…. Now a growing body of research shows that people can actually clean out their coronary arteries. The first hard evidence that lifestyle changes alone-no drugs, no surgery-can set heart disease patients on the road to improved health appeared in a study directed by Dr. Dean Ornish."

☐ দেশের প্রথম সারির হৃদরোগ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত সাময়িকী **ইব্রাহিম কার্ডিয়াক বার্তা**। এতে প্রকাশিত হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য-নিবন্ধ– হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে মেডিটেশন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮)।

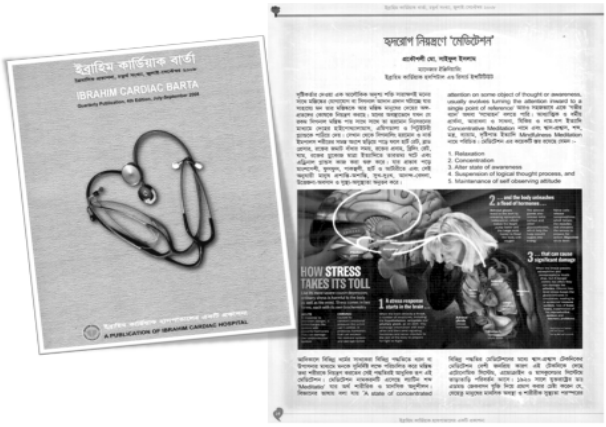

□ ভারতের স্বাস্থ্য ও জীবনধারা বিষয়ক সাময়িকী **Health & Nutrition**-এর মার্চ ২০০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত Changing picture of Heart Disease. New view puts focus on improving artery health, not fighting blockages নিবন্ধেও একই কথার প্রতিধ্বনি।

শুধু মেডিকেল সায়েন্সের জার্নাল বা বিভিন্ন পত্রিকাতেই নয়, কার্ডিওলজির প্রধান প্রধান টেক্সটবইগুলোর সাম্প্রতিক সংস্করণেও করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে জীবনধারা পরিবর্তন কর্মসূচির কথা গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে।

□ Hurst's : The Heart

(12th edition, page-2468)

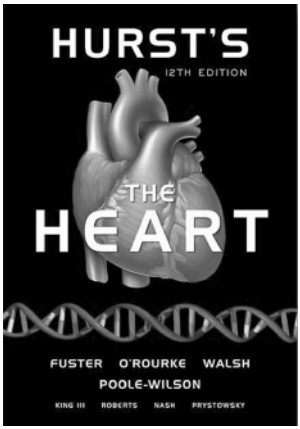

"...মেডিটেশন জীবনে শৃঙ্খলা নিয়ে আসে। শরীর স্থির হয়, মন হয়ে ওঠে প্রশান্ত। এর ফলে নিরাময়ের একটি অনুরণন সৃষ্টি হয়, যা হৃদরোগের ভীতিকর বুকব্যথা থেকে মুক্তি দেয় এবং জীবনমানের উন্নতি ঘটায়। হৃদরোগীদের জীবনধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাই এর ভূমিকা রয়েছে এবং এটি **এথেরোরিগ্রেশন** করে (করোনারি ধমনীতে জমে থাকা কোলেস্টেরলের নিঃসরণ ঘটায়)।"

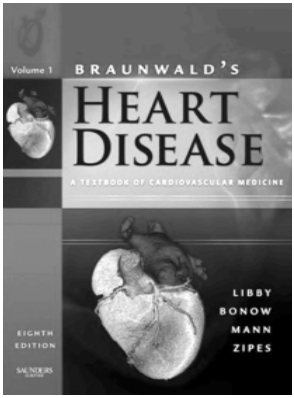

□ Braundwald's Heart Disease (8th edition, page-1157)

"...মেডিটেশন, যোগ ব্যায়াম, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস (প্রাণায়াম) ব্যথা ও দুশ্চিন্তা দূর করে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ পদ্ধতিতে মানসিক চাপ কমে ও রোগ নিরাময় সম্পন্ন হয়। মেডিটেশন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ায়।"

নিজের দায়িত্ব নিতে হবে নিজেকেই

প্রবাদ আছে, Patient cure themselves, doctors show the way. নব্য চিকিৎসাধারার প্রবর্তক ও খ্যাতনামা চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. ডিন অরনিশ, ডা. দীপক চোপড়া, ডা. এন্ড্রু ওয়েল, ডা. কার্ল সিমনটন, ডা. বার্নি সিজেল, ডা. জন রবিন্স প্রমুখ 'বডি, মাইন্ড, স্পিরিট' সাময়িকীর ১৯৯৭ সালের একটি বিশেষ সংখ্যায় 'একবিংশ শতকের স্বাস্থ্য' শীর্ষক প্রচ্ছদ কাহিনীতে বলেন, সুস্থ থাকতে হলে নিজের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে। আর নিজেকে নিরাময় করার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

আমেরিকার হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ও প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. হার্বার্ট বেনসন বলেন, একজন মানুষ রিলাক্সেশন, মেডিটেশন, ব্যায়াম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন। বর্তমানে রোগীরা যেখানে ওষুধ বা সার্জারির ওপর নির্ভর করছে, সেখানে তাদেরকে নিজেদের ওপর নির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ আপনার স্বাস্থ্য ও নিরাময়ের দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই। ডাক্তার, ওষুধ, সার্জারি সবই তখন হবে আপনার সহযোগী শক্তি।

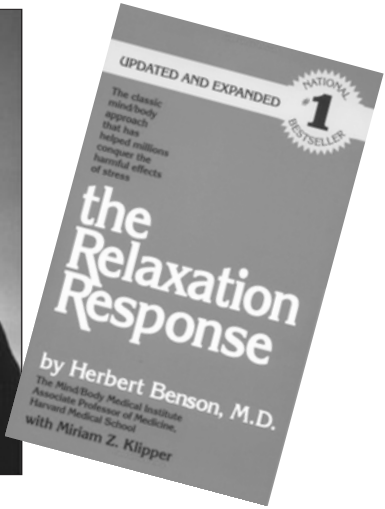

টেনশনের মনোদৈহিক প্রভাব নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ডা. হার্বার্ট বেনসন। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় তার বেস্ট সেলার বই–'রিলাক্সেশন রেসপন্স'

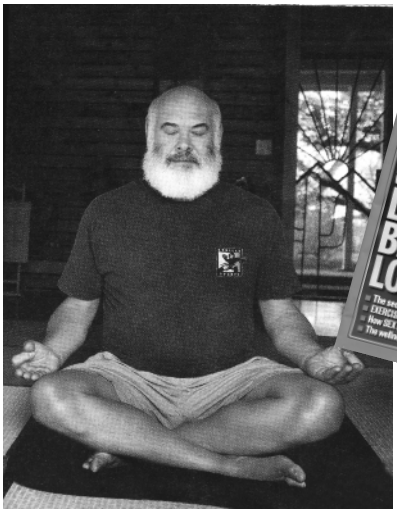

মেডিটেশন করছেন এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যাপক ডা. এন্ড্রু ওয়েল। তিনি হৃদরোগ নিরাময়ে মেডিটেশন, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও ব্যায়ামের গুরুত্বকে নতুনভাবে বর্ণনা করেছেন তার সাম্প্রতিক বইয়ে

বিশ্বখ্যাত টাইম সাময়িকীর প্রচ্ছদ নিবন্ধে ডা. এন্ড্রু ওয়েল

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর জ্যেষ্ঠ গবেষক ডা. জন রবিন্স বলেন, রোগীরা মনে করে যে, সুস্বাস্থ্য ও নিরাময় রয়েছে ডাক্তার, ড্রাগ স্টোর আর হাসপাতালে। রোগীদের ধারণা, ডাক্তার তাদের কোনো একটি ধন্বন্তরী ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা ইনজেকশন দিয়ে ভালো করে দেবেন। এ আশায় রোগীরা ডাক্তারের পর ডাক্তার আর ওষুধের পর ওষুধ বদলান, কিন্তু পূর্ণ নিরাময় লাভ করতে ব্যর্থ হন। তিনি বলেন, আসলে নিরাময় ও রোগমুক্তির ক্ষমতা আমাদের মনোদৈহিক সিস্টেমের মধ্যেই রয়েছে। ডাক্তার শুধু সহায়ক শক্তিমাত্র।

৫

মন ও মস্তিষ্কের সুসমন্বয় নিরাময় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে

আগে চাই নিজেকে জানা

দার্শনিক ও ধর্মযাজক সেন্ট অগাস্টিন বলেছিলেন, 'মানুষ রাতের আকাশ দেখে বিস্মিত হয়, সমুদ্রের বিস্তৃতি দেখে অভিভূত হয়; কিন্তু সে জানে না মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় সে নিজেই।'

সত্যিই তাই। চারপাশের কত কিছু দেখেই-না আমরা বিস্মিত হই। একশ তলা সুউচ্চ ভবন দেখে বিস্মিত হই, রকেট দেখে বিস্মিত হই, রোবট দেখে বিস্মিত হই, এমনকি উচ্চ প্রযুক্তির মোবাইল ফোন দেখেও আমরা বিস্মিত হই; কিন্তু বিস্মিত হই না শুধু নিজেকে দেখে অর্থাৎ মানুষ দেখে–যে মানুষ এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে, হরদম ব্যবহার করছে। আসলে আমরা খুব কমই নিজের দিকে তাকাই, নিজের প্রতি মনোযোগ দিই। যদি মনোযোগ দিই তবে দেখবো–কী অভূতপূর্ব আর অতুলনীয় এক সৃষ্টি এই মানবদেহ।

আমাদের দেহ গঠিত হয়েছে প্রায় ৭০ থেকে ১০০ ট্রিলিয়ন দেহকোষের সমন্বয়ে। প্রতিটি কোষে খাবার পৌঁছানোর জন্যে রয়েছে শিরা-ধমনীর প্রায় ৬০ হাজার মাইলের পাইপলাইন। আছে ফুসফুসের মতো রক্ত শোধনাগার। নিদ্রাহীন কাজ করে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের মতো শক্তিশালী পাম্প, যা একজন মানুষের জীবদ্দশায় প্রায় সাড়ে চার কোটি গ্যালনের চেয়ে বেশি রক্ত পাম্প করে থাকে। আছে চোখের মতো ছোট্ট একটি ক্যামেরা ও লেন্স, যা দিয়ে সুবিশাল এই পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য আমরা অবলোকন করি। আর দেহের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে রয়েছে স্নায়ুতন্ত্র, এন্ডোক্রাইন, রক্ত সংবহনতন্ত্রের মতো সূক্ষ্ম ও স্বয়ংক্রিয় একাধিক ব্যবস্থা।

বিজ্ঞান একসময় মনে করতো, মানুষ হচ্ছে বস্তুর সমষ্টি যা কোনো না কোনোভাবে চিন্তা করতে শিখেছে, ভাবতে শিখেছে। কিন্তু জেনেটিক সায়েন্সের ক্রমবিকাশের ধারায় এখন প্রতীয়মান হয়েছে যে, মানুষ হচ্ছে

একটি চেতনা বা তথ্যমালার বিকশিত রূপ–যা তার দেহকে নির্মাণ করেছে এবং দেহের সমস্ত শারীরবৃত্তিয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে।

মানুষ সম্পর্কে বিজ্ঞানের ধারণার এই যে আমূল পরিবর্তন, এর পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি। গত শতাব্দীতে কোয়ান্টাম ফিজিক্স, নিউরোসায়েন্স এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যে অভূতপূর্ব বিকাশ, তা মানুষ সম্পর্কে বিজ্ঞানের ধারণাকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে।

মানুষ কীভাবে চেতনা বা তথ্যমালার বিকশিত রূপ, সেটি বুঝতে হলে মানুষের জন্মরহস্যের দিকে তাকাতে হবে। বুঝতে হবে আমাদের জন্মপ্রক্রিয়া ও বেড়ে-ওঠায় ডিএনএ'র ভূমিকা।

ডিএনএ : জীবনের ব্লু-প্রিন্ট

জীবনের শুরুতে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখবো, মাতৃগর্ভে একটি ডিম্বাণুর (Ovum) সাথে একটি শুক্রাণু (Sperm) এসে মিলিত হচ্ছে। শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু–এ দুয়ের ডিএনএ মিলে তৈরি হচ্ছে একটি নতুন ডিএনএ। তৈরি হচ্ছে একটি নতুন কোষ।

ডিম্বাণু

শুক্রাণু

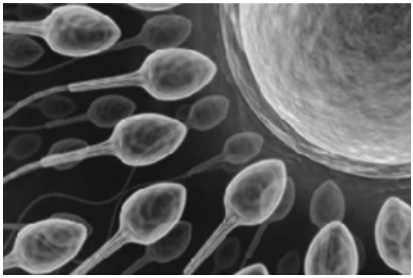

একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টারত লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু

সেই নতুন কোষটি থেকে স্ব-বিভাজন পদ্ধতিতে ১টি থেকে ২টি, ২টি থেকে ৪টি, ৪টি থেকে ৮টি, ৮টি থেকে ১৬টি, ১৬টি থেকে ৩২টি–এভাবে কোষের সংখ্যা বাড়ছে। কোষের সংখ্যা যত বাড়ছে তত নতুন নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি হচ্ছে। একসময় মানবশিশু পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে এবং সে ভূমিষ্ঠ হয়।

মাতৃগর্ভে একটি ভ্রূণের ধীরে ধীরে বেড়ে-ওঠা, একপর্যায়ে মানবশিশুতে রূপ নেয়া এবং তারপর জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষের সকল শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রম–এ সবকিছুই কিন্তু পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়

ডিএনএ দ্বারা। আমাদের শরীরে যতগুলো কোষ আছে প্রত্যেকটি কোষের কেন্দ্রে থাকে এই ডিএনএ।

এখন স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগবে, ডিএনএ কী? ডিএনএ নিয়ে গবেষণা করে প্রথম যিনি নোবেল পুরস্কার পান তিনি ড. জন কেনড্রু। ডিএনএ-কে তিনি এককথায় খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ডিএনএ হচ্ছে জীবনের ব্লু-প্রিন্ট বা জীবনের নীল নকশা। ডিএনএ এত সূক্ষ্ম যে, পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের শরীরের প্রতিটি কোষ থেকে যদি ডিএনএ-কে আলাদা করে ফেলা হয়, তবে এই ডিএনএগুচ্ছ একটি চা-চামচে রেখে দেয়া যাবে। চামচের তলানিতে এটি পড়ে থাকবে, চামচ ভরবে না।

ডিএনএ দেখতে সিঁড়ির মতো পেঁচানো একটি ফিতা। দৈর্ঘ্যে এটি এক মিটার পরিমাণ লম্বা হতে পারে। একজন মানুষের শরীরের সবগুলো কোষে যে পরিমাণ ডিএনএ টেপ থাকে, সেগুলোকে যদি একটার সাথে একটা জোড়া লাগানো হয়, তবে পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত আপনি কমপক্ষে ১০০ বার প্যাঁচ দিতে পারবেন। তারপরও এই টেপ ফুরাবে না।

কী আছে এই ডিএনএ টেপে? প্রতিটি ডিএনএ টেপে রয়েছে তিন বিলিয়ন জেনেটিক কোড এবং এই কোডগুলোকে যদি ভাষান্তরিত করা হয়–বাংলা, ইংরেজি যেকোনো ভাষায়–তাহলে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতো কমপক্ষে হাজার খণ্ডের বিশ্বকোষের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষ হচ্ছে হাজার খণ্ডের এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষের তথ্যমালায় সমৃদ্ধ একেকটি তথ্যভাণ্ডার। আর আমাদের সকল শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এই তথ্যমালা দিয়ে।

ডিএনএ দেখতে সিঁড়ির মতো পেঁচানো

শুধু যে দেহের বেড়ে-ওঠা আর শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রম পরিচালনা তা নয়, যখন আপনার ত্বক কেটে যায়, হাড় ভেঙে যায়, তখন কে জোড়া লাগায়? কে নিরাময় করে? ডাক্তার ত্বকটাকে কাছাকাছি

এনে সেলাই করে দেন, ভাঙা হাড় জায়গামতো বসিয়ে দেন; কিন্তু জোড়া লাগায় আপনার ডিএনএ'র মধ্যে বসে থাকা ডাক্তার অর্থাৎ ডিএনএ-তে সঞ্চিত নিরাময়ের তথ্যমালা।

শুধু মানুষ নয়, যেখানে প্রাণ সেখানেই ডিএনএ। গাছপালা পশুপাখি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস–যেখানেই প্রাণ সেখানেই ডিএনএ। একটা গাছের কথাই ধরা যাক। হয়তো গাছের একটা ডাল মচকে গেছে। সপ্তাহ কয়েক পর দেখা যাবে, গাছের মচকানো জায়গাটা জোড়া লেগে গেছে। এখানে কে জোড়া লাগালো? কোন ডাক্তার? জোড়া লাগালো সেই গাছের ডিএনএ'র জেনেটিক কোডে সঞ্চিত তথ্যমালা।

আগেই বলা হয়েছে, ডিএনএ হচ্ছে জীবনের ব্লু-প্রিন্ট বা নীল নকশা। কেমন নীল নকশা? ধরুন, আপনি শো-রুমে গিয়েছেন, একটি গাড়ি কিনবেন। কিন্তু দেখা গেল, আপনি গাড়ি না কিনে গাড়ির একটি ব্লু-প্রিন্ট কিনে নিয়ে এলেন। তারপর সেটি রেখে দিলেন আপনার গ্যারেজে।

এবার কল্পনা করুন, সেই গ্যারেজে ব্লু-প্রিন্ট নিজে নিজে মোটরগাড়ির চেসিস তৈরি করছে, ইঞ্জিন তৈরি করছে, সিট তৈরি করছে, সিট-কভার তৈরি করছে, উইন্ডশিল্ড তৈরি করছে, ড্রাইভিং প্যানেল তৈরি করছে, পেট্রোল ট্যাঙ্ক তৈরি করছে, চাকা তৈরি করছে, তারপরে নিজে নিজে স্প্রে করে রঙিন ঝকঝকে তকতকে হয়ে যাচ্ছে। একসময় পেট্রোল ভরে নিজে নিজেই গাড়িটি চলতে শুরু করেছে।

এই পুরো বিষয়টিকে যদি কল্পনা করতে পারেন, তাহলে প্রাণের বিকাশে ডিএনএ'র ভূমিকাকে আপনি চমৎকারভাবে বুঝতে পারবেন, উপলব্ধি করতে পারবেন। বাবার শুক্রাণু আর মায়ের ডিম্বাণু মিলে যে একটি নতুন ডিএনএ ও নতুন কোষ তৈরি হয়েছিলো, তা থেকেই আমাদের পুরো শরীর গঠিত হয়েছে আর সেইসাথে পরিচালিত হচ্ছে সব ধরনের শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রম।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, ডিএনএ হলো চেতনা বা তথ্যমালার সমষ্টি। আর এই চেতনা যদি দেহ সৃষ্টি করতে পারে, চেতনা যদি কাটা ত্বক জোড়া লাগাতে পারে, ভাঙা হাড় জোড়া লাগাতে পারে, তবে চেতনা কেন নিরাময় করতে পারবে না? চেতনা কেন তথাকথিত নিরাময়-অযোগ্য রোগব্যাধি থেকে মুক্ত করে আপনাকে নিরাময়ের পথে নিয়ে যেতে পারবে না? এটি তখনই সম্ভব–যখন আপনি বিশ্বাস করবেন।

বিশ্বাসী হোন ॥ বিশ্বাসে মিলায় 'নিরাময়'

নিরাময় সাফল্য প্রশান্তি সবই আপনি পেতে পারেন–যদি আপনি বিশ্বাস করেন। আসলে রোগ এবং সুস্থতার মধ্যে যদি কোনো দেয়াল থাকে, সেটি হচ্ছে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের। বিশ্বাস নিরাময় করে। আর দ্বিধা দ্বন্দ্ব সন্দেহ সংশয় মানুষকে রোগগ্রস্ত ও অসুস্থ করে তোলে। এমন ঘটনা একটি দুটি নয়, অসংখ্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে দুজন হৃদরোগীর কথা।

রাকিব সাহেব ও ইকবাল সাহেব (ছদ্মনাম)। তারা বন্ধু এবং সহকর্মী। দুজনই ব্যাংকার। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর দুজনকেই ডাক্তার বলেছেন, স্টেন্টিং করেও তেমন লাভ হবে না, বাইপাস অপারেশনই লাগবে। একসময় দুজনই ভর্তি হলেন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশনে।

রাকিব সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন–তিনি সুস্থ জীবনাচার পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ভালো থাকার চেষ্টা করবেন, বাইপাস অপারেশনের কাটাছেঁড়া ও ঝুঁকির মধ্যে যাবেন না। বিশ্বাস নিয়ে অনুসরণ শুরু করলেন তিনি। ভুল জীবন-অভ্যাসের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এলেন একটু একটু করে। নিয়মিত মেডিটেশন, হাঁটা, ব্যায়াম, চর্বিমুক্ত খাবারে অভ্যস্ত করে তুললেন নিজেকে। দুই যুগেরও বেশি সময়ের বন্ধু (!) সিগারেটের সঙ্গ ত্যাগ করলেন পুরোপুরি। নিয়মিত সাপ্তাহিক কাউন্সেলিং সেশনে উপস্থিত হয়ে সবার সাথে খোলামেলা আলোচনায় অংশ নিলেন, ক্লাবের অন্য সদস্যদেরও উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন সুস্থ জীবনাচার অনুসরণে। শেষপর্যন্ত রাকিব সাহেবের আর বাইপাস অপারেশনের প্রয়োজন হয় নি। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে তিনি আজ সুস্থ আছেন, সুন্দরভাবে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। এমনকি বছরখানেক আগে একটি গুরুতর পেশাগত স্ট্রেসও তার সুস্থতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি, তিনি চমৎকারভাবে সামলে নিয়েছেন।

অন্যদিকে, ইকবাল সাহেব হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পুরো বিষয়টি ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি ভাবলেন, আমি কিছু নিয়ম পালন করবো, আর সুস্থ হয়ে যাবো–এটা কীভাবে সম্ভব? তিনি বাইপাস অপারেশন করালেন। দুঃখজনক হলেও সত্যি, তিনি কিন্তু আগের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন নি। অপারেশনের কিছুদিন যেতে না যেতে বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। কিছুদিন আগে জানা গেল, হার্ট ফেইলিওরে ভুগছেন তিনি এবং এখন রীতিমতো শয্যাশায়ী।

মস্তিষ্কের শক্তিরহস্য

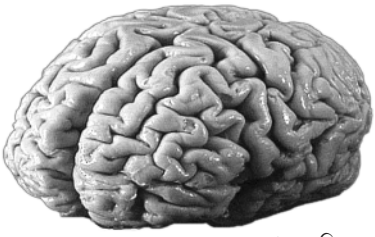

মানব মস্তিষ্ক

আমরা দেখেছি, মায়ের ডিম্বাণু আর বাবার শুক্রাণু থেকে যে নতুন ডিএনএ তৈরি হয়েছিলো, মূলত সেখান থেকেই মানবদেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি ও বিকাশ। এমনকি মস্তিষ্কের মতো জটিলতর অঙ্গটিও তৈরি হয়েছে সেই একটি ডিএনএ থেকেই।

ব্রেন বা মস্তিষ্ক আমাদের খুলির ভেতর অবস্থিত আশ্চর্য এক অঙ্গ, যা স্পাইনাল কর্ডের মাধ্যমে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ পুরো শরীরের স্নায়বিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্ক আবৃত থাকে মেনিন্‌জেস নামক তিন স্তর বিশিষ্ট পর্দা দিয়ে। মস্তিষ্কের ওজন প্রায় দেড় কিলোগ্রাম। আমাদের খুলির ভেতর সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (সিএসএফ) নামে এক ধরনের তরল পদার্থ থাকে। এর মধ্যে ভাসে বলে মস্তিষ্কের ওজন অনুভূত হয় মাত্র ৫০ গ্রাম।

মস্তিষ্কে রয়েছে প্রায় ১০০ বিলিয়ন নিউরোন। প্রতিটি নিউরোন কমপক্ষে ১০ হাজার নিউরোনের সাথে সংযুক্ত। কোনো কোনো নিউরোন প্রায় পাঁচ লক্ষ নিউরোনের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। আমরা যদি মস্তিষ্ককে সুবিশাল আকাশের সাথে কল্পনা করি, তবে নিউরোনগুলো হচ্ছে এর নক্ষত্র।

মস্তিষ্কের বাম ও ডান বলয়

মানবদেহের সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় আর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি হচ্ছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক দুই অংশে সমানভাবে ডান ও বাম বলয়ে বিভক্ত থাকে। ডান ও বাম বলয় আড়াআড়িভাবে স্নায়ুগুচ্ছ দিয়ে সংযুক্ত থাকায় মস্তিষ্কের ডান বলয় নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের বাম অংশকে এবং বাম বলয় নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের ডান অংশকে।

দুই বলয়ের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাম বলয় বেশি সক্রিয় থাকে এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করে কথা শ্রুতি অঙ্ক যুক্তি ভাষা ক্ষুধা হজম ও বৈষয়িক ভাবনা। আর ডান বলয় নিয়ন্ত্রণ করে কল্পনা আবেগ বিশ্বাস ঘুম স্বপ্ন সংগীত সৃজনশীলতা অতিচেতনা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনা।

ব্রেনের বাম এবং ডান বলয়ের বৈশিষ্ট্য অনুসারে মানুষের যাবতীয় আচরণকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। বাম বলয়ের প্রভাবে অধিকাংশ মানুষ জন্মের পর থেকে শুধু চায় আর চায়। জন্মের পর শিশু কান্না করে

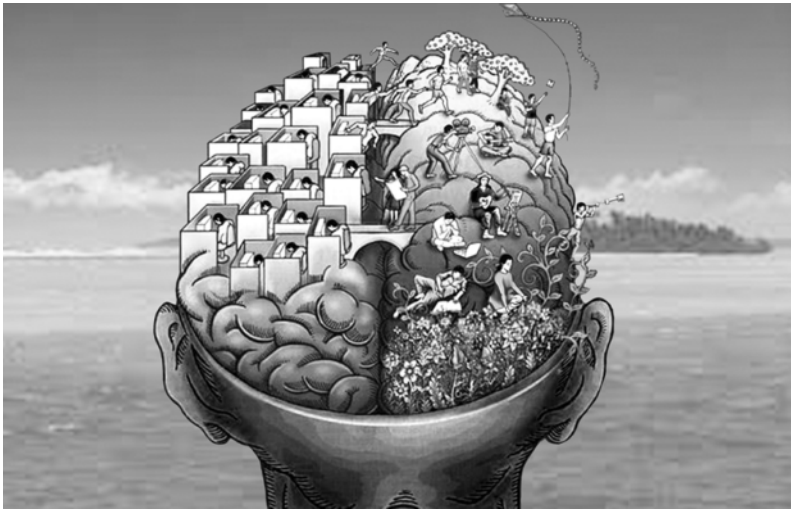

মস্তিষ্কের বাম বলয় নিয়ন্ত্রণ করে কথা শ্রুতি অঙ্ক যুক্তি ভাষা ক্ষুধা হজম ও বৈষয়িক ভাবনা। ডান বলয় নিয়ন্ত্রণ করে কল্পনা আবেগ বিশ্বাস ঘুম স্বপ্ন সংগীত সৃজনশীলতা অতিচেতনা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনা।

অর্থাৎ দুধ চায়। একটু বড় হলে চকলেট চায়, চিপ্‌স চায়, খেলনা চায়, তারপর যত বড় হতে থাকে তার চাওয়ার পরিধিও বাড়তে থাকে। বাড়ি চায়, গাড়ি চায়, সম্পদ চায়, জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী চায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ চাওয়ার কোনো শেষ থাকে না।

অন্যদিকে, যাদের ডান বলয় বেশি সক্রিয় তাদের দিকে তাকালে মনে হবে, তাদের কাছে এই পৃথিবীটা হচ্ছে দুদিনের দুনিয়া। কাঁথা বালিশ কম্বল নিয়ে তারা মসজিদে মসজিদে অথবা মন্দির মঠ আশ্রমে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিংবা কেউ কেউ আবার ব্যস্ত নানা ধরনের সৃজনশীল কাজে। যেমন : চিত্রকলা সংগীত সাহিত্য ইত্যাদি।

এই দুই গ্রুপের মধ্যে সঠিক পথে আছেন কারা? আমরা বলতে পারি, দুই বলয়ের মধ্যে যিনি সমন্বয় করতে পেরেছেন, দুই বলয়ের মধ্যে যিনি যোগসূত্র সৃষ্টি করতে পেরেছেন, জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার সাথে যিনি নিজের সৃজনশীলতা ও আত্মিক অনুভূতির ভারসাম্যপূর্ণ সংযোগ ঘটাতে পেরেছেন তিনিই মূলত সফল।

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বিষয়টি আমরা সহজেই বোঝার চেষ্টা করতে পারি। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সফলতম ব্যক্তি কে? হযরত মুহাম্মদ (স)। আসুন আমরা দেখি, কীভাবে তিনি পৃথিবীর সফলতম ব্যক্তি–

বাম বলয়কে তিনি সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যবহার করেছিলেন। ১২ বছর বয়সেই তিনি তাঁর চাচার বাণিজ্য-কাফেলার সাথে মরুভূমিতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। মরুভূমির পথ এতটাই দুর্গম ছিলো যে, পথের কষ্টের কথা বিবেচনা করে সে সময় পূর্ণ যুবক ছাড়া কাউকে কাফেলায় নেয়া হতো না। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় গিয়েছিলেন। যখন পূর্ণ যুবক তখন তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা এত প্রখর ছিলো যে, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মা খাদিজা তাঁকে ব্যবসার অংশীদার করে নেন। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন সফল সেনানায়ক। শুধু তা-ই নয়, নবীজী ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক।

অন্যদিকে, ডান বলয়কেও সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যবহার করেছিলেন নবীজী। অতিক্রম করেছিলেন আত্মিক আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চতর স্তর। ব্রেনের দুই বলয়ের মাঝে চমৎকার এক সমন্বয় আর ঐকতান সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন ইতিহাসের এই সফলতম মানুষ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যিনি তার মস্তিষ্ককে যত বেশি ব্যবহার করতে পেরেছেন, দুই বলয়ের মধ্যে সমন্বয় ও যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছেন, তিনিই সফল হয়েছেন।

মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

আমাদের সব শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রমই নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক। আর মস্তিষ্ক এটি করে মূলত নার্ভাস ও এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের মাধ্যমে। তাই এ দুটি হলো শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সিস্টেম।

এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের সকল গ্ল্যান্ডের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। এ কারণে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে বলা হয় মাস্টার গ্ল্যান্ড। এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে হাইপোথ্যালামাস। হাইপোথ্যালামাস যেহেতু মস্তিষ্কেরই অংশ; তাই বলা যায়, এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের মাধ্যমে মস্তিষ্ক পুরো শরীরকেই নিয়ন্ত্রণ করছে।

এছাড়াও, স্পাইনাল কর্ড এবং তা থেকে শাখা-প্রশাখার মতো বের হওয়া ৩১ জোড়া নার্ভের মাধ্যমেও নিয়ন্ত্রিত হয় শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অর্থাৎ সবদিক বিবেচনায় মস্তিষ্কই আমাদের দেহের মূল নিয়ন্ত্রক।

তাহলে কেন আমরা মস্তিষ্ককে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করছি না? এত শক্তিশালী আর মহামূল্যবান মস্তিষ্ক, এটি কিন্তু একা কোনো কাজ করতে পারে না। এর কাজকে নানাভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে আমাদের মন।

সাইকো-নিউরো-ইমিউনোলজি ॥
চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিস্ময়

মন এবং মস্তিষ্কের সম্পর্ক নিয়ে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি নতুন ধারা 'সাইকো-নিউরো-ইমিউনোলজি'। 'সাইকো' মানে মন; ব্রেনের নিউরোন এবং সেইসাথে নার্ভাস সিস্টেমকে বোঝানো হয়েছে 'নিউরো' শব্দটি ব্যবহার করে আর 'ইমিউনোলজি' হলো শরীরের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

অর্থাৎ মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্রেন ও নার্ভাস সিস্টেমকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত ও কর্মক্ষম করে তোলাই হলো সাইকো-নিউরো-ইমিউনোলজির মূল লক্ষ্য। পুরো বিষয়টি একটি ছোট্ট গল্প দিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

ধরা যাক, একজন লোক হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোনোভাবেই আর হাঁটতে পারছে না, ক্লান্তিতে মাটিতে পড়ে আছে। হয়তো কাছেই তার বাড়ি কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও এখন তার নেই। এমন সময় সে যদি শোনে যে, একটা বাঘ আসছে, তাহলে সে উঠে দৌড় দেবে।

ন্যূনতম শক্তিহীন হয়ে পড়া মানুষটি দৌড় দেয়ার এ শক্তিটুকু পেলো কোথায়? ব্যাপারটা সত্যিই খুব চমকপ্রদ। এক্ষেত্রে 'বাঘ আসছে' তথ্যটি সাইকোলজিক্যাল ইনপুট হিসেবে লোকটির ভেতরের শক্তিটুকু জাগিয়ে দিলো। ফলে মুহূর্তেই তার শরীরের সবগুলো স্নায়ু-পেশি সজাগ আর কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলো। সাইকো-নিউরো-ইমিউনোলজির চমৎকার ও বাস্তবভিত্তিক একটি উদাহরণ এটি।

১৯৭০ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাইকো-নিউরো-ইমিউনোলজি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। গবেষণা করেন ড. অ্যালেন গোল্ডস্টেইন এবং ড. জন মোটিল। দুজনই সাইকিয়াট্রিস্ট এবং নিউরোলজিস্ট। এদের সাথে ছিলেন দুজন নিউরোসার্জন ড. ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড এবং ড. ই রয় জন। দীর্ঘ গবেষণার পর তারা বলেছেন, একজন প্রোগ্রামার যেভাবে কম্পিউটারকে পরিচালিত করে মনও ঠিক সেভাবেই ব্রেনকে পরিচালিত করে।

আসলে কম্পিউটারের কিন্তু নিজে কিছু করার ক্ষমতা নেই। কম্পিউটার হচ্ছে কিছু হার্ডওয়্যারের সমন্বয়ে একটি যন্ত্র মাত্র। একজন প্রোগ্রামার সেটিকে যেভাবে প্রোগ্রাম দেন তা সেভাবেই চলে। মনও তেমনি মস্তিষ্ককে যেভাবে প্রভাবিত করে, ব্রেন ঠিক সে অনুসারেই কাজ করে। তাই নিরাময়, সুস্বাস্থ্য আর সাফল্যের জন্যে মনের শক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করে ব্রেনকে সঠিক প্রোগ্রামিং বা তথ্য দিতে হবে।

জানতে চাই মনের খবর

এখন আমরা একটু বুঝতে চেষ্টা করবো–মন কী, আর নিরাময়ের ক্ষেত্রে মনের ভূমিকাটাই-বা কেমন?

মন এমন একটা কিছু, যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী একে টেস্টটিউবে নিয়ে নিরীক্ষণ করতে পারেন নি, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আওতার মধ্যেও আনতে পারেন নি। মন সম্পর্কে আমাদের অতীতের সাধকরা যেভাবে বলেছেন বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরাও ঠিক একইভাবে বলেন, Mind is the source of all power. অর্থাৎ একজন মানুষের আসল শক্তির উৎস কিন্তু তার হাত নয়, পা নয়, তার পেশি নয়, এ শক্তির উৎস হচ্ছে তার মন। আর মনের এই শক্তি রহস্যকে যদি বুঝতে পারি, তাহলে আমরা এই শক্তিকে চমৎকারভাবে ব্যবহারও করতে পারবো।

মনের এই শক্তিকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে পারলে আপনি যা চান, সেই প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত চাওয়াকে আপনি পাওয়ায় রূপান্তরিত করতে পারবেন। মনের শক্তি যে কী অসীম, তার প্রমাণ আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। কথা বলতে পারেন না, হাত-পা নাড়াতে পারেন না, হাঁটাচলা তো দূরে থাক, দুআঙুল ছাড়া কিছু নাড়াতে পারেন না; কিন্তু এই মানুষটিই তার মনের শক্তি দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করে লিখলেন সাড়া জাগানো বই–দি ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম। মানব মনের অসীম শক্তি এভাবে দেহের সীমাবদ্ধতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

আমাদের মনের রয়েছে তিনটি স্তর :

সচেতন মন : সবকিছুই নিজের ধারণা, যুক্তি ও বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনা করে।

অবচেতন মন : অবচেতন মন ভালোমন্দ কোনোকিছুই বিচার করে না। পূর্বে প্রাপ্ত তথ্য, পরিকল্পনা বা ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে কাজ করে।

অবচেতন মন আবার সচেতন মনের কথা সহজেই শোনে। অবচেতন মন সবসময়ই কাজ চায়। সে প্রায়শই প্রভাবিত হয় পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যার কাঁচামাল হয় ভয়-ভীতি, নানা অমূলক আশঙ্কা কিংবা অন্যান্য অযাচিত বিষয় ইত্যাদি। কিন্তু সচেতন প্রচেষ্টায় অবচেতন মনকে কাজে লাগিয়ে অনেক আপাত অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলা যায়।

অবচেতন মনের এই শক্তিভাণ্ডারকে ব্যবহার করেই ফরাসী মনোবিজ্ঞানী ও সাইকোথেরাপিস্ট এমিল কুয়ে গত শতাব্দীর শুরুতে অটোসাজেশনের

মাধ্যমে বহু রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। ১৯২০ সালে এ নিয়ে প্রকাশিত হয় তার বই–Self-Mastery Through Conscious Autosuggestion.

অচেতন বা অতিচেতন মন : বিজ্ঞানীরা যাকে বলছেন অচেতন মন, সাধকরা তাকেই বলেন অতিচেতন মন। অবচেতন ও অতিচেতন মনের মাঝখানের দরজাটি খুলতে পারলেই সচেতন মন সংযোগ স্থাপন করতে পারে মহাচেতনার সাথে।

মন ও মস্তিষ্ক : চির-অচ্ছেদ্য এক বন্ধন

মন ও মস্তিষ্কের বিচিত্র সম্পর্ক আর এ দুয়ের পারস্পরিক প্রভাব নিয়ে বিশ্বজুড়ে পরিচালিত হয়েছে অসংখ্য গবেষণা। এ গবেষণায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ও ম্যাসাচুসেট্স জেনারেল হাসপাতালের মাইন্ড বডি ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডা. হার্বার্ট বেনসন। এ বিষয়ে তার রয়েছে ১৭৫টি গবেষণা-প্রতিবেদন এবং ১১টি বই। যার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে 'ট্রেইন ইয়োর ব্রেন চেঞ্জ ইয়োর মাইন্ড' ও 'দি মাইন্ড বডি ইফেক্ট'।

মন যেহেতু মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, নিরাময় ও সুস্থতার জন্যে এই মন নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব তাই অনেক বেশি। সাধারণভাবে আমরা অধিকাংশ মানুষই মনকে আমাদের কথা শোনাতে পারি না, মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারি না, সেক্ষেত্রে অবস্থাটা দাঁড়ায় 'মনের আমি', আর একজন সত্যিকারের সাধক বা প্রজ্ঞাবান যিনি, তিনিই শুধু বলতে পারেন–'আমার মন'।

মন ও ব্রেনের সম্পর্ক

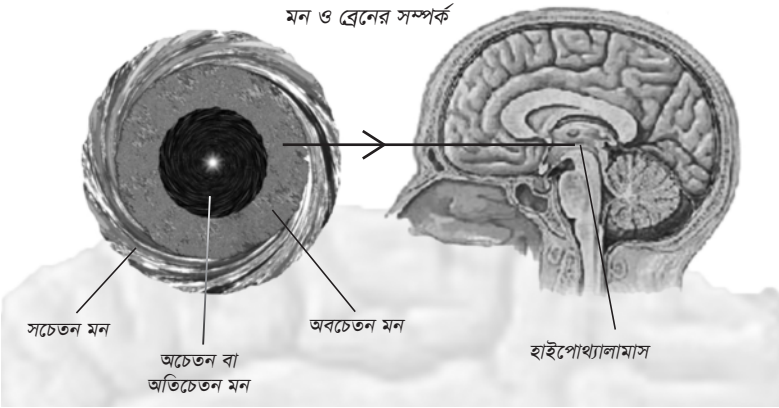

মন ও দেহ আসলে মানুষের জন্মসূত্রেই অবিচ্ছেদ্য আর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। একে চাইলেও আলাদা করা যায় না। দেহ ও মন পরস্পর স্নায়ুগুচ্ছ ও বার্তাবাহক রাসায়নিক অণু (নিউরোট্রান্সমিটার) দ্বারা সারাক্ষণ সংযোগ রেখে চলেছে। বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আমাদের দেহে প্রায় ৬০ ধরনের বার্তাবাহক রাসায়নিক অণু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

মন ও দেহের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে ব্রেনের হাইপোথ্যালামাস। এই হাইপোথ্যালামাসেই আবেগের যেকোনো পরিবর্তন প্রথম লিপিবদ্ধ হয় এবং হাইপোথ্যালামাস বার্তাবাহক রাসায়নিক অণু নিঃসরণের মাধ্যমে দৈহিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। যেমন, কোনো কারণে আপনি মনে ভীষণ কষ্ট পেলেন। আপনজন কষ্ট দিয়েছে। আপনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। কষ্ট ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে।

আপনি কষ্ট পেলেন, এটি মনের বিষয়। এই কষ্টের তথ্য অবচেতন মনের মাধ্যমে আপনার ব্রেনের হাইপোথ্যালামাসে পৌঁছে গেল। তখন কী ঘটে? হাইপোথ্যালামাস থেকে কষ্টের বার্তাবাহক রাসায়নিক অণু নিঃসৃত হয় এবং তা আপনার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং হৃদযন্ত্রে। তেমনিভাবে রাগ ক্ষোভ দুঃখ হতাশা বিষণ্নতার মতো নেতিবাচক আবেগের প্রতিক্রিয়াতেও একই ধরনের বার্তাবাহক রাসায়নিক অণু শরীরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত করে হৃৎপিণ্ডকেও। যার অন্যতম পরিণতি করোনারি হৃদরোগ।

তাই শুধু হৃদরোগ মুক্তি নয়, বরং সার্বিক সুস্থতার জন্যেই একজন মানুষের সব ধরনের নেতিবাচক আবেগ (রাগ ক্ষোভ ঘৃণা ঈর্ষা বিষণ্নতা) থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত হওয়াটা জরুরি। কারণ, নেতিবাচক আবেগ-অনুভূতি দিনের পর দিন ভেতরে জমা হতে থাকলে মানুষ ক্রমশ অসুস্থ ও উদ্যমহীন হয়ে পড়ে এবং ভুগতে থাকে দীর্ঘমেয়াদি রোগ-যন্ত্রণায়।

আর এ থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় হচ্ছে আত্মনিমগ্ন হয়ে নিজের দিকে ফিরে তাকানো অর্থাৎ মেডিটেশন। মেডিটেশনে পাওয়া সুখকর প্রশান্তির ফল্গুধারা মনকে সব ধরনের নেতিবাচক ও ক্ষতিকর আবেগের প্রভাব থেকে মুক্ত করে। সেইসাথে প্রয়োজন জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা জানবো, মনের এই শক্তিকে ব্যবহার করে নিরাময়ের মনছবি (কল্পচিত্র) অবলোকনের মাধ্যমে রোগমুক্তি–বিশেষ করে হৃদযন্ত্রকে আমরা কীভাবে সুস্থ করে তুলতে পারি।

৬

মেডিটেশন ॥
হৃদরোগ নিরাময় করে

নিরাময়ের জন্যে চাই সুস্থতার তীব্র আকুতি

অসুস্থ হলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা সুস্থ হয়ে উঠতে চাই। নিরাময়ের জন্যে আসলে প্রথম প্রয়োজন সুস্থতার এই আকুতি। দেখা গেছে, এই আকুতি যার মধ্যে যত তীব্র আর প্রবল তার নিরাময়ও ঘটে তত দ্রুত। নিরাময়ের পাশাপাশি সুস্থ জীবনের জন্যেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ।

খ্যাতনামা মেডিকেল জার্নাল 'ল্যানসেট'-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, ক্যান্সারে ভুগছিলেন এমন রোগীদের মধ্যে যারা তাদের ক্যান্সার নিয়ে তেমন আতঙ্কিত ছিলেন না কিংবা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে যাদের ভেতর এক ধরনের লড়াকু মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, তাদের ক্যান্সার জয়ের হার অন্যান্য রোগীদের চেয়ে তুলনামূলক বেশি, যারা ক্যান্সারের কাছে নিজেকে অসহায় মনে করেছে এবং একপর্যায়ে বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

এমনই একজন হলেন জিম। কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে ডা. বার্নি সিজেল জিমের অপারেশন করলেন। একসময় কেমোথেরাপি দেয়া হলো। তারপরও চিকিৎসকদের মতে তার বাঁচার সম্ভাবনা আর বড়জোর ছয় মাস। কিন্তু জিম ছিলেন ভীষণ লড়াকু মনের এক মানুষ। তিনি ব্যাপারটাতে তেমন ভয় তো পেলেনই না, আবার কেমোথেরাপির সবগুলো সাইকেলও নিতে এলেন না হাসপাতালে। কিন্তু তবু সমস্ত পরিসংখ্যানকে মিথ্যা প্রমাণ করে কয়েক বছর শুধু নয়, তিনি বেঁচে ছিলেন কয়েক দশক।

ডা. বার্নি সিজেলের আরেক রোগী আর্ভিং। পেশায় তিনি ছিলেন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ফিন্যান্সিয়াল এডভাইজার। পেশাগত কারণে পরিসংখ্যান নিয়েই ছিলো তার কাজ-কারবার। লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে একসময় অনকোলজিস্টের কাছে গেলেন তিনি। অনকোলজিস্ট সব শুনে পরিসংখ্যান দেখে বললেন, এ রোগে খুব বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনা নেই।

এমনিতেই ডাক্তারের এ ধরনের কথা শুনে রোগীরা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। আর্ভিং-এর ক্ষেত্রে সেটা হলো আরো প্রকট। বেঁচে থাকার জন্যে ন্যূনতম চেষ্টা বা নিরাময়ের সম্ভাবনা–এ দুটোই অযৌক্তিক মনে হলো আর্ভিং-এর কাছে। পরিসংখ্যানটাই তার কাছে হয়ে উঠলো একমাত্র সত্য ও সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। তিনি ভাবলেন, আমার পুরো জীবনটাই কেটেছে পরিসংখ্যান নিয়ে আর সেই পরিসংখ্যানই বলছে যে, আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তবে আর বাঁচার উপায় কী? হাল ছেড়ে দিয়ে একসময় তিনি বাড়ি ফিরে যান এবং এর অল্প কদিন পরই মারা যান।

এই যে বেঁচে থাকার ইচ্ছা, বেঁচে থাকার স্বপ্ন এবং আকুতি–সুস্থতার জন্যে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কারণেই নিরাময়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী প্রক্রিয়া হচ্ছে ইমেজ থেরাপি বা নিরাময়ের মনছবি দেখা।

মেডিটেশন আপনাকে বদলে দেয় ভেতর থেকেই

আপনার দেহের প্রতিটি কোষের ডিএনএ-র মধ্যে নিরাময়ের যে তথ্যমালা সঞ্চিত আছে, আপনার প্রয়োজনীয় মনোযোগের অভাবে তা এতদিন সুপ্ত ছিলো। এখন আপনি আপনার এই শক্তি সম্বন্ধে জেনেছেন। সচেতন হয়ে উঠেছেন। এবার বিশ্বাসী হয়ে উঠুন। আপনার এ বিশ্বাসই একটু একটু করে আপনাকে নিরাময়ের পথে নিয়ে যাবে। আপনাকে সুস্থ করে তুলবে।

আবার এতদিন মনে করা হতো যে, ডিএনএ-ই হচ্ছে আপনার নিয়তি। ডিএনএ-র এই প্রোগ্রামিং কোনোভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ডিএনএ-র জেনেটিক কোডে ভালোমন্দ যে তথ্যমালা রয়েছে শেষপর্যন্ত তা-ই হবে, আপনার শরীরের সুখ-অসুখের যাবতীয় ব্যাপারগুলোও সে অনুযায়ীই ঘটবে। অর্থাৎ জেনেটিক বা বংশগত রোগের কোনো ঝুঁকি বা সম্ভাবনা আপনার জিন-এ থাকলে তা থেকে আর রক্ষা নেই। আপনার কিছুই করার নেই রোগভোগের যন্ত্রণা পোহানো আর ওষুধ খাওয়া ছাড়া।

কিন্তু জিনবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা এতদিনকার এ ধারণা পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। একাধিক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, না, আপনারও কিছু করার আছে। আপনার মধ্যে যদি আকুতি সৃষ্টি হয়, আপনি যদি প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন পদ্ধতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেন তবে আপনি অবশ্যই আপনার ডিএনএ-কে প্রভাবিত করতে পারবেন। এভাবে বদলে যেতে পারে আপনার ডিএনএ-র জেনেটিক কোডে সঞ্চিত তথ্যমালাও।

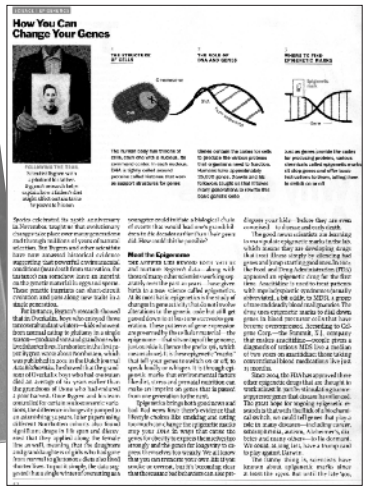
How You Can Change Your Genes

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ডিএনএ-র মধ্যে জিনের (Gene) পাশাপাশি এপিজেনোম (Epigenome) নামক একটি অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জিন হচ্ছে হার্ডওয়্যার আর এপিজেনোম হচ্ছে সফ্‌টওয়্যার। অর্থাৎ জিন প্রভাবিত হয় এপিজেনোম দ্বারা। 'Why your DNA is not your destiny' শিরোনামে টাইম ম্যাগাজিনের ৬ জুন ২০১০ সংখ্যায় বিষয়টি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

জিনবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে, একজন মানুষ তার ইচ্ছা আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে তার এপিজেনোমের প্রোগ্রামিং পরিবর্তন করতে পারে, সে অনুসারে বদলে দিতে পারে জিনের তথ্যমালা এবং শেষ পর্যন্ত তার দেহের শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রমও সেভাবেই পরিচালিত হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, অভূতপূর্ব এই উদ্ভাবন জিনবিজ্ঞানের জগতে নতুন সম্ভাবনা ও নতুন দিগন্তের সূচনা করতে যাচ্ছে।

শুধু তা-ই নয়, আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স জেনারেল হাসপাতালের একদল বিজ্ঞানী দীর্ঘ গবেষণার পর দেখেছেন, মেডিটেশন জিনের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে। তাদের মতে, গভীর শিথিলায়ন, মনছবি এবং জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে উচ্চ রক্তচাপ থেকে পুরোপুরি নিরাময় লাভ করা সম্ভব। 'Relaxation changes genes' শিরোনামে এটি প্রকাশিত হয়েছে রিডার্স ডাইজেস্ট সাময়িকীর জানুয়ারি ২০১০ সংখ্যায়।

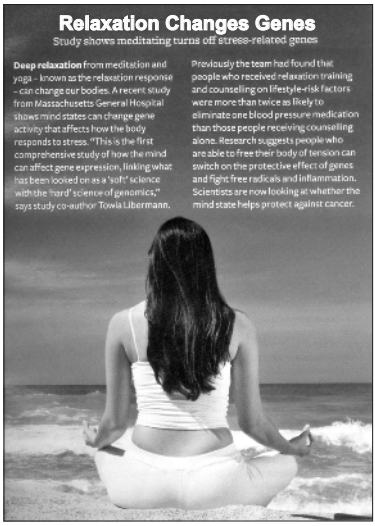

Relaxation Changes Genes

Study shows meditating turns off stress-related genes

Deep relaxation from meditation and yoga – known as the relaxation response – can change our bodies. A recent study from Massachusetts General Hospital shows mind states can change gene activity that affects how the body responds to stress. "This is the first comprehensive study of how the mind can affect gene expression, linking what has been looked on as a 'soft' science with the 'hard' science of genomics," says study co-author Towia Libermann.

Previously the team had found that people who received relaxation training and counselling on lifestyle-risk factors were more than twice as likely to eliminate one blood pressure medication than those people receiving counselling alone. Research suggests people who are able to free their body of tension can switch on the protective effect of genes and fight free radicals and inflammation. Scientists are now looking at whether the mind state helps protect against cancer.

রিডার্স ডাইজেস্ট জানুয়ারি ২০১০-এ প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদন– Relaxation Changes Genes

নিয়মিত মনছবি রোগ নিরাময় করে

চিকিৎসা ও সুস্থতার ক্ষেত্রে মনছবি প্রয়োগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন আমেরিকার টেক্সাসের চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. কার্ল সিমনটন। আধুনিক চিকিৎসাজগতে তার উদ্ভাবিত 'ইমেজ থেরাপি' প্রয়োগ করে বহু মানুষ রোগমুক্ত হয়েছেন। এমনকি ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছেন এমন অন্তিম অবস্থা থেকেও বহু রোগী ইমেজ থেরাপির মাধ্যমে নিরাময় লাভ করেছেন, সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

ইমেজ থেরাপি বা মনের চিত্রকল্পের শক্তি যে কতটা কার্যকরী হতে পারে, তা বোঝা যায় কিশোর গ্লেন-এর ঘটনা থেকে। তার ব্রেন টিউমার ধরা পড়েছিলো। চিকিৎসক বললেন, এই টিউমার আর সারবে না। অপারেশন করিয়ে বা কেমোথেরাপি দিয়েও কোনো লাভ হবে না।

তাই গ্লেনকে বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। চিকিৎসায় ভালো হওয়ার কোনো আশাই যখন দেখা গেল না, তার বাবা তাকে মেডিটেশন শেখাতে নিয়ে গেলেন। মেডিটেশনে সে ইমেজ থেরাপির প্রক্রিয়া শিখলো। গ্লেন নিজের মতো করে চিত্রকল্প অবলোকন করতো–রকেটে বসে সে তার মাথার চারপাশে উড়তে থাকতো এবং রকেট থেকে ব্রেনের টিউমারকে লক্ষ করে গুলি করতো। সেইসাথে কল্পনা করতো যে, টিউমারটি ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। এভাবে প্রতিদিন কয়েকবার সে চিত্রকল্প দেখতো।

বেশ ক'মাস পর গ্লেন তার বাবাকে বললো যে, আমি রকেটে করে আমার ব্রেনের চারপাশে ঘুরে এসেছি এবং সেখানে আমি কোনো টিউমার খুঁজে পাই নি। যখন গ্লেন আরেকটি সিটি স্ক্যান করার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো তখন গ্লেনের বাবা তাকে আবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ডাক্তার বললেন, অযথা টাকা খরচ করে কাজ নেই। কারণ এই টিউমারটি নিরাময়-অযোগ্য (Incurable), এটি এত সহজে সারবে না।

এদিকে গ্লেন যেহেতু সুস্থ বোধ করতে লাগলো সে আগের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। আবার স্কুলে যেতে শুরু করলো। একদিন স্কুলে সে হঠাৎ পড়ে গেলে তাকে আবার সেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। টিউমার হয়তো আরো মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে বলেই সে পড়ে গেছে–ডাক্তার এমনটা আশঙ্কা করলেন। ঘটনা আসলে তা-ই কি না সেটি দেখার জন্যে গ্লেনের আরেকবার সিটি স্ক্যান করানো হলো। বিস্ময়করভাবে দেখা গেল, তার ব্রেনে কোনো টিউমারের অস্তিত্ব নেই।

মনছবি কেন?

রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মনছবি কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের দুটি পরিপূরক মত রয়েছে।

প্রথম দলের অভিমত হচ্ছে, মনছবি মস্তিষ্কের বাম ও ডান বলয়ের তৎপরতার মধ্যে একটি ভারসাম্য ও সুষম সমন্বয় সাধন করে। মনছবি দেখতে শুরু করার সাথে সাথে ডান বলয় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং দুই বলয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যহীনতা থাকে তা-ও দূর হয়ে যায়।

আরেক দলের অভিমত হলো–আবেগ, চিত্রকল্প ও অনুভূতির মধ্যে রয়েছে এক গভীর সংযোগ। যেকোনো আবেগের দৈহিক প্রকাশ ঘটতে পারে। আমরা জানি, ব্রেনের ভাষা হচ্ছে ছবি। তাই ছবি বা চিত্রকল্প দিয়ে ব্রেন যত সহজে প্রভাবিত হয় অন্য কোনো কিছু দিয়েই সে ততটা প্রভাবিত হয় না, কারণ আমাদের নার্ভাস সিস্টেম বাস্তব ও কল্পনার পার্থক্য করতে পারে না। যেমন : আমরা ঠিক জানি যে, সিনেমায় যা দেখানো হচ্ছে তা নিছক অভিনয়, এর আনন্দ সুখ দুঃখ বেদনা কোনোকিছুই সত্যিকারের নয়। তবু দেখা যায়, সিনেমা দেখার সময় নায়ক-নায়িকার দুঃখে আমরা বিমর্ষ ও ভারাক্রান্ত হই, কাঁদি। কিংবা ভয়ের কোনো দৃশ্য দেখলে আমরা বেশ ভয় পাই।

অর্থাৎ আমরা যা দেখছি তা তো বটেই, যা কল্পনা করছি বা ভাবছি, এমনকি আশঙ্কা করছি তার সবই ব্রেন বাস্তব বলে ধরে নেয়। এ কারণেই

অসচেতনভাবে অমূলক ভয়-ভীতি আর নেতিবাচক কিছু কল্পনা বা আশঙ্কা না করে সবসময় আমাদের উচিত সচেতনভাবে আনন্দময় আশাপ্রদ সুখকর ও সুস্থ জীবনের কথা চিন্তা করা।

এই আশাবাদী মনোভাব আর বিশ্বাসই নিরাময়ের ক্ষেত্রে সবসময় মূখ্য ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাষ্ট্রের মেনিঙ্গার ফাউন্ডেশনের চিকিৎসক ডা. এলমার এবং এলিস গ্রিন নিরাময় লাভ করেছেন এমন চারশত ক্যান্সার রোগীর ওপর জরিপ চালিয়ে দেখেছেন, অসুস্থ হওয়ার পর এদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে নিরাময়ের ব্যাপারে দারুণ আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। অতএব, ক্যান্সার-আক্রান্ত রোগী যখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন তখন আপনিও রোগমুক্তির ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী হোন। মনে রাখবেন, ওষুধের চেয়ে আপনার চেতনা অনেক বেশি শক্তিশালী ও সর্বত্রগামী।

যখন কোনো ব্যক্তি অবচেতন মনে ক্রমাগত এই বিশ্বাস লালন করতে থাকে যে, সে আর কখনো সুস্থ হবে না বা সে আর বাঁচতে চায় না, তখন দেখা যায় যে, চিকিৎসা যতই কার্যকরী হোক, যত ভালো আর দামি ওষুধ হোক, রোগমুক্তির ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয় না।

আর আমরা যখন শরীরের কোনো একটি অঙ্গের সুস্থতার মনছবি দেখি, তখন মূলত কী করি? দিনের পর দিন আমাদের উদাসীনতা আর অমনোযোগিতার ফলে দেহের যে অঙ্গটি অসুস্থ হয়েছিলো, মনছবি দেখার মাধ্যমে আমরা তার প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগটুকু দিই। সে অঙ্গের প্রতি গভীর মমতা পোষণ করি। আসলে এই মমতা বা ভালবাসার শক্তিকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিমাপ করা কঠিন। তবু বিজ্ঞানীরা শরীর ও শারীরবৃত্তিয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মমতার প্রভাবকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন।

মেনিঙ্গার ফাউন্ডেশনের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের জীবন ও মন মমতায় পরিপূর্ণ তাদের রক্তে ক্ষতিকর ল্যাকটেটের পরিমাণ অনেক কম, তারা ক্লান্তি অনুভব করেন কম। এবং তাদের রক্তে এন্ডোরফিনের (আনন্দের বার্তাবাহক রাসায়নিক অণু) পরিমাণ থাকে তুলনামূলক বেশি। ফলে তারা সবসময় একটি আনন্দ ও সুখানুভূতির মধ্যে থাকেন। দুঃখ বোধ করেন কম। তাদের শ্বেতকণিকা জীবাণুর বিরুদ্ধে দ্রুত সাড়া দেয়। খুব কমই তারা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা এই জাতীয় অসুস্থতায় ভোগেন। অর্থাৎ যারা নিরাময়ের আশায় সুস্থতার তীব্র আকুতি নিজের ভেতর পোষণ করেন, সুস্থ হতে চান, নিরাময়ের মনছবি দেখেন এবং কল্পনা করেন যে, তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন–দেখা যায়, তারা ধীরে ধীরে নিরাময়ের পথে এগিয়ে যান। সুস্থ হয়ে ওঠেন।

সুস্থ স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের মনছবি দেখুন

করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কীভাবে মনছবি দেখবেন? অবলোকন করুন, মনের বাড়ির নিরাময় কক্ষে প্রবেশ করেছেন আপনি। আপনার প্রিয় ডাক্তার সেখানে বসে আছেন। আপনি যাওয়ার পর কুশল জানতে চেয়ে ডাক্তার আপনাকে বিছানায় শুতে বললেন। এরপর তিনি আপনার ঊরুর কাছের ধমনীতে বিশেষ একটি ইনজেকশন দিলেন।

ইনজেকশন থেকে নিঃসৃত আলোর কণা ফোটন অসংখ্য ছোটবড় রক্তনালী বেয়ে পৌঁছে গেল আপনার হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীতে। তারপর সেখানে জমে থাকা চর্বির স্তরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পাঠিয়ে দিচ্ছে কিডনিতে, আর কিডনি তা বর্জ্য হিসেবে মূত্রের সাথে বের করে দিচ্ছে।

এবার অবলোকন করুন, আপনার করোনারি ধমনীতে চমৎকারভাবে রক্ত চলাচল করছে এবং এখন তাতে আর কোনো ব্লকেজ নেই। আপনার হৃৎপিণ্ড আগের মতোই সুস্থ সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আপনি ফিরে পেয়েছেন আপনার স্বাভাবিক জীবন আর তারুণ্যদীপ্ত কর্মচাঞ্চল্য।

করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন যারা, তারা দিনে দুবার এ পদ্ধতিতে নিরাময়ের মনছবি দেখুন। মেডিটেটিভ লেভেলে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সবগুলো অনুভূতিকেই কাজে লাগিয়ে সুস্থতার আনন্দ অনুভব করুন। দেহ-মনে এ আনন্দ-অনুরণন ছড়িয়ে দিন। স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায়ও যখনই সময় পাচ্ছেন, সচেতনভাবে বার বার সুস্থ ধমনী ও সুস্থ হৃৎপিণ্ডের দৃশ্যকল্প অবলোকন করুন। নিরাময়ের জন্যে এটি অত্যন্ত কার্যকরী।

ডা. ডিন অরনিশ তার 'প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ' বইয়ে মনের এ শক্তি সম্বন্ধে লিখেছেন–'হৃদরোগীরা কল্পনায় সবসময় দেখেন ব্লকেজযুক্ত করোনারি ধমনী, কিন্তু তারা যখন পরিকল্পিতভাবে সুস্থ ও পরিষ্কার ধমনী অবলোকন করেন তখন সত্যিই একসময় ধমনীর জমাটবদ্ধ কোলেস্টেরল ধীরে ধীরে নিঃসৃত হতে শুরু করে।'

তাই ক্রমাগত দুশ্চিন্তা করে করে রোগ সৃষ্টি না করে সচেতনভাবে ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠুন। মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায়, Where mind goes, energy flows.

মেডিটেশন ॥ হৃদরোগ নিরাময়

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির দরবার কক্ষে যান। তারপর ৩ থেকে ০ গণনা করে পৌঁছে যান নিরাময় কক্ষে। আপনি পৌঁছে গেছেন নিরাময় কক্ষে।

অবলোকন করুন নিরাময় কক্ষে ঢুকতেই আপনার প্রিয় ডাক্তার হাসিমুখে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। আপনিও হেসে তার সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

২. এবার আপনি তার সামনে চেয়ারে আরাম করে বসুন।

আপনার সব সমস্যা, হৃদরোগের বিস্তারিত ইতিহাস খুলে বলুন তাকে। এক এক করে সবকিছু বলুন। সময় নিয়ে বলুন .....

আপনার ডাক্তার গভীর মনোযোগ দিয়ে আপনার সমস্যা ও অসুবিধার কথা শুনছেন .....

৩. ডাক্তার আপনাকে শুয়ে পড়তে বলছেন। আপনি শুয়ে পড়েছেন।

অবলোকন করুন, আপনার সামনে মনিটর। ডাক্তার আপনার চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখুন, তার মুখে পরমাত্মীয়ের স্মিত হাসি। হাসি দিয়ে তিনি আপনাকে অভয় দিচ্ছেন।

৪. অবলোকন করুন, গভীর মমতায় তিনি আপনার ডান ঊরুসন্ধির ধমনীতে একটি বিশেষ ইনজেকশন পুশ করছেন। সামনের মনিটরে দেখছেন আপনার হৃৎপিণ্ডের ধমনীর কার্যকারিতা ও ব্লকেজের পরিমাণ .....

আপনার ডাক্তার খুব খুশি। আপনার হার্টের অবস্থা যা ভাবা হয়েছিলো হার্ট তার চেয়েও অনেক ভালো অবস্থায় আছে। তিনি অনুভব করছেন, পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আপনি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।

৫. তিনি এবার অপ্রয়োজনীয় চর্বিনাশক ফোটন ইনজেকশন দিচ্ছেন আপনার ঊরুসন্ধির ধমনীতে .....

অবলোকন করুন, ইনজেকশনের সাথে উজ্জ্বল সোনালি আলোর কণা স্রোতের মতো এগিয়ে যাচ্ছে ধমনী বেয়ে .....

হৃৎপিণ্ডের যে ধমনীর দেয়ালে ব্লকেজ বা চর্বি আছে সোনালী আলোর কণা আস্তে আস্তে তাতে আঘাত করছে .....

ধীরে ধীরে জমাটবাঁধা চর্বি ছোট ছোট টুকরো হয়ে রক্তের প্রবাহে পড়ছে, শ্বেতকণিকা এই চর্বির টুকরোগুলোকে ধরে ফেলছে, কিডনিতে নিয়ে পেশাবের সাথে বের করে দিচ্ছে .....।

৬. অবলোকন করুন, আপনার হার্টে যে কয়টি ব্লকেজ আছে সবগুলোই এভাবে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে .....।

অনুভব করুন ব্লকেজ খুলে যাচ্ছে ..... আর হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে রক্ত চলাচল বেড়ে যাওয়ায় আপনার হার্ট ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে .....

অবলোকন করুন, হার্টের ধমনীর দেয়ালে জমে থাকা সব অপ্রয়োজনীয় পদার্থ পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে। হার্টের প্রত্যেকটি ধমনীতে এখন স্বচ্ছন্দ গতিতে রক্ত চলাচল করছে ..... সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনি।

৭. নিজের সুস্থ স্বাভাবিক হার্ট দেখে আনন্দিত হয়ে উঠছেন আপনি।

অনুভব করুন, আপনার সাথে সাথে আপনার হার্টও যেন একইভাবে আনন্দিত হয়ে উঠেছে। মনিটরে আপনার হার্টকে দেখে মনে হচ্ছে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা হাস্যোজ্জ্বল একটি শিশুর মুখ।

৮. আপনি এবার উঠে বসেছেন। আগের চেয়ে সতেজ, প্রফুল্ল ও ঝরঝরে অনুভব করছেন। গভীরভাবে অনুভব করছেন সুস্থতার আনন্দ ও তৃপ্তি।

পরম করুণাময়ের কাছে বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। শুকরিয়ায় নিজের অন্তরকে প্লাবিত করুন।

ডাক্তার এখন আপনার সুস্থতার জন্যে প্রার্থনা করছেন .....

৯. এবার নিরাময় কক্ষের ডান কোনায় রাখা বাথটাবের সামনে এসে দাঁড়ান। স্নানের পোশাক পরে বাথটাবে গা এলিয়ে দিন। পানিতে অনুভব করুন আপনার প্রিয় সুগন্ধি মিশ্রিত রয়েছে। গন্ধকে পুরোপুরি উপলব্ধি করুন। অনুভব করুন পানির পরশে চমৎকার এক আমেজ সৃষ্টি হয়েছে আপনার শরীরে।

অনুভব করুন আপনার ভেতরে জমে থাকা অসুস্থতার সকল অনুভূতি পানির স্রোতের সাথে ধুয়ে মুছে চলে যাচ্ছে ..... অনুভব করুন আপনার সারা শরীরে নিরাময়ের একটা স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে।

১০. এবার মনে মনে ৩ বার কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করুন।

অনুভব করুন আপনার নিরাময় সম্পন্ন হয়েছে। অবলোকন করুন, আপনি যেমন চান, তেমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছেন।

এবার মনে মনে প্রত্যয়ন করুন, সুস্থ থাকার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত। সুস্থতা স্বাভাবিক আর অসুস্থতা অস্বাভাবিক। আমি প্রাকৃতিক নিয়মেই সুস্থ হচ্ছি, প্রাণবন্ত হচ্ছি, সফল হচ্ছি, সুখী হচ্ছি।

১১. এবার ০ থেকে ৩ গণনা করে প্রথমে দরবার কক্ষে ও পরে ০ থেকে ৭ গণনা করে স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

৭

কোয়ান্টাম ব্যায়াম করুন নিয়মিত হাঁটুন

সুস্বাস্থ্য একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। নবীজী (স) বলেছেন, সুস্বাস্থ্য হচ্ছে স্রষ্টার সবচেয়ে বড় নেয়ামত। এই কথাটি হয়তো তিনিই বেশি উপলব্ধি করতে পারেন যিনি অসুস্থ হন। কিন্তু আমরা সুস্থতার মধ্য দিয়েই অনুভব করতে চাই সুস্বাস্থ্যের অনুভূতি।

সুস্বাস্থ্যের জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু জীবন-অভ্যাস অনুসরণ করে আমরা চমৎকারভাবে সুস্থ থাকতে পারি। আর এ সম্বন্ধে আমাদের একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আমরা বলি, সুস্বাস্থ্যের কোয়ান্টাম ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি :

১. দম
২. আহার
৩. ব্যায়াম
৪. হজম
৫. রেচন

এ অধ্যায়ে আমরা দম এবং ব্যায়াম সম্পর্কে জানবো। অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে অধ্যায় ১০-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দম : জীবনের মূল ছন্দ

দম হচ্ছে জীবনের মূল ছন্দ। খাবার ছাড়া আপনি বেশ কিছুদিন বাঁচতে পারবেন, পানি ছাড়াও কয়েকদিন বাঁচা সম্ভব। কিন্তু দম ছাড়া অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া আপনি বড়জোর পাঁচ মিনিট বাঁচতে পারেন, এর বেশি নয়।

অক্সিজেন আমাদের দেহের Bio-Electrical Balance নিয়ন্ত্রণ করে, আর খাবার দেহের Bio-Chemical Balance নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

সাধারণত আমরা দু'ভাবে দম নিয়ে থাকি :

☐ Abdominal breathing (ওপর পেটে দম) : স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের দম নেয়ার সহজাত পদ্ধতিটি হলো এই এবডোমিনাল ব্রিদিং। কিন্তু এভাবে দম নিলে ফুসফুস পূর্ণ মাত্রায় প্রসারিত হতে পারে না। ফুসফুস বঞ্চিত হয় পর্যাপ্ত অক্সিজেন থেকে। যার ফলে অধিকাংশ মানুষই আমরা পূর্ণ কর্মশক্তি ও প্রাণ-চঞ্চলতা নিয়ে কাজ করতে পারি না।

☐ Thoracic breathing (বুক ফুলিয়ে দম) : এভাবে দম নিলে ফুসফুস পূর্ণ মাত্রায় প্রসারিত হতে পারে। প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুস কাজ করতে পারে তার পুরো কর্মক্ষমতা নিয়ে। ফলে ক্লান্তি দূর হয় নিমেষেই এবং শরীর-মন সারাদিন প্রফুল্ল থাকে। এটাই দম নেয়ার সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, শ্বসনতন্ত্রের অনেক অসুখের কারণ হলো সঠিকভাবে দম নিতে না পারা। দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা অধিকাংশ মানুষই এ ব্যাপারে উদাসীন। সঠিকভাবে দম নেয়া তখনই হবে–যখন আপনি নাক দিয়ে দম নেবেন, আপনার বুক ফুলবে এবং ফুসফুস প্রসারিত হবে পূর্ণ মাত্রায়। এভাবে দম নিলে সারাদিন আপনি থাকবেন কর্মোদ্যমী ও প্রাণবন্ত। তাই যখনই পারেন, সচেতনভাবে বুক ফুলিয়ে দম নিন।

দমের মধ্য দিয়ে শরীরে শুধু অক্সিজেনই প্রবেশ করে না, এক ধরনের প্রাণশক্তিও প্রবেশ করে। সাধকরা এটিকে বলতেন 'প্রাণা'। তাই দম চর্চার এই পদ্ধতিকে প্রাচীন যোগ ব্যায়ামের ভাষায় সাধকরা অভিহিত করেছেন 'প্রাণায়াম' নামে। প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় ও দেহকে জ্বরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে বলেই এর নাম প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম আপনার দেহ ও মনের মধ্যে ব্রিজ বা সেতু হিসেবে কাজ করে। স্ট্রেসের কারণে যখন সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম উদ্দীপ্ত হয়, দেহ-মনে চলতে থাকে ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স, তৈরি হয় অস্থিরতা অশান্তি এবং করোনারি ধমনীতে অযাচিত সংকোচন ইত্যাদি। আর এ অবস্থায় নিয়মিত প্রাণায়াম বা দমচর্চা আপনার দেহ-মনকে টেনশনমুক্ত করে। ভেতরে সৃষ্টি হয় এক অনাবিল প্রশান্তি। সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের উদ্দীপনা কমে আসে। ফলে করোনারি ধমনীতে যে ক্ষতিকর সংকোচন সৃষ্টি হয়েছিলো সেটি দূর হয়।

যোগ সাধনায় বহু ধরনের প্রাণায়াম রয়েছে। এর মধ্যে হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে উপকারী দুটি প্রাণায়াম হচ্ছে সহজ উজ্জীবন ও নাসায়ন। দিনের

যেকোনো সময় যেকোনো পরিবেশে আপনি খুব সহজেই এ দুটি প্রাণায়াম অনুশীলন করতে পারেন। মুহূর্তেই হয়ে উঠতে পারেন টেনশনমুক্ত ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

সহজ উজ্জীবন

পদ্ধতি : মেরুদণ্ড পুরোপুরি সোজা রেখে দাঁড়ান অথবা বসুন। দুই হাত কোমরের দুই পাশে রাখুন। তাতে ফুসফুস পূর্ণমাত্রায় প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এবার সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বুক ফুলিয়ে দম নিন। দম নেবেন নাক দিয়ে, মুখ বন্ধ থাকবে। দম নেয়ার সাথে সাথে বুক ফুলবে, ওপরের পেট নয়। ফুসফুস সর্বোচ্চ প্রসারিত হওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড দম ধরে রাখুন, ফুস্ করে ছেড়ে দেবেন না।

এবার ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেয়ার চেয়ে দম ছাড়তে একটু বেশি সময় নিন। একবার দম নেয়া হলো। এভাবে ১৯ বার দম নিলে এক দফা সহজ উজ্জীবন হবে। সারাদিনে পাঁচ/ ছয় দফা চর্চা করুন।

নাসায়ন বা একনাসা প্রাণায়াম

পদ্ধতি : মেরুদণ্ড সোজা রেখে প্রথমে এক পা ওপরে তুলে আরেক পা ভাঁজ করে নিচে রেখে (১ নং ছবির মতো) বসুন। প্রথমে নাক দিয়ে বুক ভরে দম নিন। এবার ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নাকের ডান পাশের নাসাছিদ্র চেপে ধরুন (ছবির মতো)। এমনভাবে ধরুন যেন বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে। এবার বাম পাশের ছিদ্র দিয়ে দম নিয়ে অনামিকা দিয়ে বাম পাশের ছিদ্রটিও বন্ধ করে দিন। তারপর বাম ছিদ্র বন্ধ রেখেই ডান ছিদ্র থেকে বুড়ো আঙুল তুলে ডান ছিদ্র দিয়ে দম ছাড়ুন। বাম ছিদ্র বন্ধ রাখা অবস্থায়ই নাকের ডান ছিদ্র দিয়ে পুনরায় দম নিন। দম নেয়া হলে বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান ছিদ্র বন্ধ করে পুনরায় বাম ছিদ্র দিয়ে দম ছাড়ুন। এভাবে একবার বাম নাক বন্ধ রেখে ও ডান নাক দিয়ে ছাড়া আবার ডান নাক বন্ধ রেখে বাম নাক দিয়ে ছাড়া–এই মিলে এক প্রস্থ হবে। এভাবে ছয় থেকে ১০ প্রস্থ করতে পারেন। নাসায়ন পদ্মাসনে বসেও করতে পারেন।

নাসায়ন : ছবি– ১

হাত ও
আঙুলের
ভঙ্গি

পদ্মাসনে নাসায়ন : ছবি– ২

প্রাণায়ামের ফলে ফুসফুসে প্রচুর অক্সিজেন প্রবেশ করে। দেহ-মন মুহূর্তেই সজীব ও সতেজ হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি স্নায়ু ও পেশি শিথিল হতে শুরু করে। এছাড়াও, মাইগ্রেন নিরাময়ে নাসায়ন বেশ উপকারী।

প্রতিদিন হাঁটুন ॥ আপনার হৃৎপিণ্ড ভালো থাকবে

করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্যে তো বটেই, আপনার সার্বিক সুস্থতার জন্যেই প্রতিদিন নিয়ম করে ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা হাঁটুন। কোয়ান্টাম ব্যায়ামের সাথে নিয়মিত হাঁটা যুক্ত হলে ব্যায়ামের সবগুলো উপকারই আপনি পরিপূর্ণভাবে লাভ করবেন। আর হৃদরোগীদের সুস্থতার জন্যে নিয়মিত হাঁটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন?

প্রথমত, আমরা আগেই জেনেছি, এইচডিএল কোলেস্টেরল আমাদের শরীরের জন্যে ভালো। যাদের এটি প্রয়োজনের তুলনায় কম, নিয়মিত হাঁটলে তাদের শরীরে এইচডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ে।

দ্বিতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত হাঁটেন যারা, তাদের হৃৎপিণ্ডের চারপাশে কোলেটারাল সারকুলেশন তৈরি হয়। সেটা কেমন?

আমরা অনেক সময় শুনি, কারো একটি বা কখনো কখনো দুটি করোনারি ধমনীতেই রক্ত চলাচল শতভাগ বন্ধ অর্থাৎ ১০০% ব্লকেজ। মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, তবে তিনি বেঁচে আছেন কী করে? কারণ, রক্তনালী শতভাগ

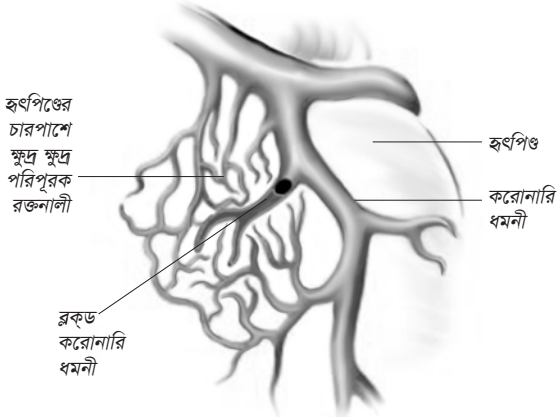

কোলেটারাল সার্কুলেশন

বন্ধ হয়ে পড়লে তো হৃৎপিণ্ডের কোষ আর পেশিগুলো প্রয়োজনীয় রক্ত ও পুষ্টির অভাবে পুরোপুরি অকেজো এমনকি মারা যাওয়ার কথা। কিন্তু তার ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে না কেন?

এর অন্যতম কারণ হলো, এদের হৃৎপিণ্ডের ব্লকেজ-আক্রান্ত ধমনীর চারপাশে কিছু পরিপূরক রক্তনালী সচল হয়ে ওঠার মাধ্যমে একটি কোলেটারাল সারকুলেশন গড়ে ওঠে। এখানে যে বিষয়টি ঘটে তা হলো, হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীর চারপাশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালী থাকে, যারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, ব্যায়াম করেন, বিশেষত যারা নিয়মিত হাঁটেন, তাদের এই রক্তনালীগুলো সচল হয়ে ওঠে এবং মূলত এই বিকল্প রক্ত সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমেই হৃৎপিণ্ডের সব অংশে প্রয়োজনীয় রক্ত পৌঁছে যায়। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালীর সংখ্যা কারো কারো ক্ষেত্রে দুশ থেকে আড়াইশটি পর্যন্ত হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে ন্যাচারাল বাইপাস হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ের একটি উপায় হিসেবে বর্তমানে দেশে-বিদেশে ইসিপি নামে একটি চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচলন ঘটেছে। যার মূল উদ্দেশ্য প্রধানত এটাই–কোলেটারাল সারকুলেশন গড়ে তোলা। আর এ উপকারটিই বিনা অর্থব্যয়ে আপনি চমৎকারভাবে লাভ করতে পারেন নিয়মিত ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা হাঁটা এবং ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে। নিয়মিত হাঁটার ফলে একদিকে আপনার ন্যাচারাল বাইপাসের সম্ভাবনা বাড়লো, এর পাশাপাশি হাঁটার অন্যান্য উপকারিতাগুলোও আপনি লাভ করলেন।

তৃতীয়ত, নিয়মিত হাঁটলে দেহের বাড়তি ওজন কমে। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত ওজন করোনারি হৃদরোগের একটি অন্যতম কারণ। এসব কারণেই করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে হাঁটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু তা-ই নয়, নিয়মিত হাঁটেন যারা, তাদের বয়সজনিত স্মৃতিভ্রম রোগ আলঝেইমারের ঝুঁকি কমে অনেকখানি। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত হাঁটার গুরুত্ব এখন কমবেশি সবাই জানেন।

কীভাবে হাঁটবেন? আপনার হাঁটার গতি হবে ঘণ্টায় চার মাইল। অর্থাৎ মিনিটে প্রায় ১০০ কদম। কিন্তু প্রথমদিন হাঁটতে নেমেই এ গতিতে হাঁটতে যাবেন না, হাঁটার গতি প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়ান। যদি আপনার হার্টের অবস্থা বিবেচনা করে কার্ডিওলজিস্ট ঘণ্টায় চার মাইল বেগে হাঁটার অনুমতি না দেন, তবে তিনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই হাঁটুন।

ব্যায়াম ॥ সুস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ

দেহ-মনের সুস্থতা এবং জীবন-অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ থেকে মুক্ত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো ব্যায়াম। কেন? স্রষ্টা এমনভাবে আমাদের দেহ সৃষ্টি করেছেন যে, পরিশ্রম করলে বা কষ্ট করলে আপনি ভালো থাকবেন। পবিত্র কোরআনে সূরা আল-বালাদের ৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে কষ্ট ও শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।'

অথচ ভালো থাকার নামে আমরা আজ আরাম-আয়েশে ডুবে গিয়েছি, আমরা শ্রমবিমুখ হয়ে পড়েছি অর্থাৎ কায়িক শ্রমকে আমরা গুরুত্বহীন মনে করছি। কিন্তু চারপাশে একটু খেয়াল করলে আমরা দেখবো, যারা শারীরিক পরিশ্রম করছেন, দিন-রাত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন, তারাই তুলনামূলক ভালো আছেন। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক এ জাতীয় রোগে তারা কম আক্রান্ত হচ্ছেন।

আধুনিক নগর-জীবনে আমরা এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, দিনের পর দিন আমাদের কায়িক পরিশ্রম করার সুযোগ হয় না। কিন্তু সুস্থ থাকতে হলে শারীরিক শ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

জীবনযাপনে আরাম-আয়েশের অসংখ্য উপকরণের ফলে এখন যেহেতু আমাদের শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন অনেক কমে গেছে, তাই সচেতনভাবে ও পরিকল্পিত উপায়ে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে যদি সুস্থ থাকতে চাই। কারণ, সুস্থতার জন্যে শারীরিক পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। আর এই সচেতন ও পরিকল্পিত পরিশ্রমটাই হতে পারে ব্যায়াম।

ব্যায়াম আছে নানান ধরন আর রকমের। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান্ধব, কার্যকরী, সহজ এবং আধুনিক মানুষের উপযোগী ব্যায়াম হলো কোয়ান্টাম ব্যায়াম।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম ॥ আধুনিক মানুষের ব্যায়াম

খ্রিষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে সিন্ধুনদ তীরবর্তী অঞ্চলে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি জাতির বসবাস ছিলো। তারা সেই সময় এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো, যা পরিচিত হয়েছিলো দ্রাবিড় সভ্যতা নামে।

তারা 'যোগসাধনার' মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতো। 'যোগ' (Yoga) শব্দটি এসেছে সংযোগ থেকে। সাধকরা বলেন, আমাদের আত্মা পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই এত অশান্তি, এত অতৃপ্তি, এত হাহাকার। তাই পরমাত্মার সাথে আত্মার সংযোগ স্থাপনই ছিলো যোগসাধনার অন্যতম উদ্দেশ্য। যোগ সাধনার একটি ধাপ বা স্তর হচ্ছে 'আসন', যা পরবর্তীতে সময়ের পথ ধরে আমাদের কাছে যোগ ব্যায়াম নামে পরিচিতি পেয়েছে।

পাশ্চাত্যে একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, সব ধরনের ব্যায়ামের মধ্যে সেরা হলো যোগ ব্যায়াম। কারণ, মানুষ শুধু দেহেরই অধিকারী নয়, তার রয়েছে একটি সংবেদনশীল মন। আর এই দেহ ও মন জন্মাবধি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মনের প্রভাব যেমন দেহে পড়ে তেমনি দেহের সুখ-অসুখও প্রভাবিত করে আমাদের মনকে। আর যোগ ব্যায়াম হচ্ছে একমাত্র ব্যায়াম, যেখানে দেহের সাথে সাথে আপনি আপনার মনকেও সম্পৃক্ত করতে পারেন। যোগ ব্যায়াম মনের অস্থিরতা বিষণ্নতা দূর করে। এসব কারণে পাশ্চাত্যেও যোগ ব্যায়ামের জনপ্রিয়তা ও চর্চা দিন দিন বাড়ছে।

এছাড়াও, যোগ ব্যায়ামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এ ব্যায়াম পদ্ধতিতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পেশির জন্যে আলাদা আলাদা আসন রয়েছে। যেমন, হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে রয়েছে কিছু বিশেষ আসন– উজ্জীবন, ভুজঙ্গাসন, অর্ধ-শলভাসন, শলভাসন, পবনমুক্তাসন, গোমুখাসন, উষ্ট্রাসন, বজ্রাসন, শবাসন ইত্যাদি।

যখন আপনি এই ব্যায়ামগুলো করবেন তখন অন্যান্য উপকারিতার পাশাপাশি হৃৎপিণ্ড বিশেষভাবে উপকৃত হবে। করোনারি ধমনী প্রসারিত হবে, হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ বাড়বে। ব্যায়ামের সময় যদি আপনি অবলোকন করেন যে, করোনারি ধমনীতে যে ব্লকেজ ছিলো তা দূর হয়ে গেছে, সেখানে প্রচুর রক্ত চলাচল করছে, তখন আপনি আপনার মনের শক্তিটাকেও সেখানে যোগ করে দিলেন। দেহকে স্ট্রেসমুক্ত রাখার জন্যে, পেশির টেনশনজনিত অতিরিক্ত সংকোচন দূর করার জন্যে এবং একই সাথে মেরুদণ্ড ও শরীরের সমস্ত অস্থিসন্ধিগুলোকে নমনীয় রাখার জন্যে এর কোনো বিকল্প নেই।

যোগ ব্যায়ামেরই একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক সংস্করণ হলো কোয়ান্টাম ব্যায়াম। বাংলাদেশে আশির দশকের শুরু থেকে দীর্ঘ ২৫ বছরের নিরন্তর চর্চা ও গবেষণার ফল হচ্ছে কোয়ান্টাম ব্যায়াম। এখানে বিভিন্ন আসনের সাথে দমের সম্পর্ককে শিথিল করা হয়েছে। ফলে আধুনিক মানুষের কাছে কোয়ান্টাম ব্যায়াম দিন দিন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

হৃদরোগীদের জন্যে যেসব কারণে কোয়ান্টাম ব্যায়াম প্রয়োজন

১. সংকুচিত পেশি ও ধমনীর যথাযথ প্রসারণ করে।
২. শরীরের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল এলডিএল-এর পরিমাণ কমায়।
৩. উপকারি কোলেস্টেরল এইচডিএল-এর পরিমাণ বাড়ায়।
৪. মানসিক চাপ কমায়।
৫. অতিরিক্ত ওজন কমায়।
৬. করোনারি ধমনীর ব্লকেজ কমিয়ে ধমনী-পথে রক্তপ্রবাহ বাড়ায়।
৭. কোলেটারাল সারকুলেশন তৈরি হয়।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম শুরু করার আগে জেনে নিন

- ☐ প্রতিদিন ন্যূনতম ৩০ মিনিট কোয়ান্টাম ব্যায়াম করুন।
- ☐ কোয়ান্টাম ব্যায়াম করার সময় আরামদায়ক ঢিলেঢালা পোশাক পরুন।
- ☐ একেবারে খালি পেটে অথবা একেবারে ভরপেটে ব্যায়াম করা উচিত নয়। হালকা কিছু খেয়ে ব্যায়াম করা যায়। যেমন, ভেজানো কাঁচা ছোলা (দুই/ তিন টেবিল চামচ) অথবা দুই/ তিন টুকরো কাঁচা পেঁপে।
- ☐ খুব শক্ত বা নরম জায়গায় ব্যায়াম করা উচিত নয়। মেঝেতে কার্পেট বা কাঁথা-কম্বল বিছিয়ে তার ওপর চাদর বিছিয়ে ব্যায়াম করা উচিত।
- ☐ পূর্ণ আহারের তিন থেকে চার ঘণ্টা পরে ব্যায়াম করা উচিত।
- ☐ আলো-বাতাসপূর্ণ খোলা জায়গায় ব্যায়াম করা ভালো।

- শীতের সময় ঘরের দরজা-জানালা খুলে বাতাস প্রবেশ করিয়ে নিয়ে ব্যায়াম করুন। এতে ঘরে প্রচুর অক্সিজেন প্রবেশ করবে।
- কোয়ান্টাম ব্যায়াম করার সময় কথা বলবেন না, কোনো রকম গান-বাজনা শুনবেন না; বরং যে আসন করছেন সে আসনের উপকারিতার বিষয়গুলো কল্পনা করুন ও পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে অনুভব করুন।
- ব্যায়াম করার ফলে শরীরে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যায়। তাই হঠাৎ করে যাতে গরম/ ঠান্ডা না লাগে সেজন্যে ব্যায়াম শেষে ১০ মিনিট শিথিলায়ন বা শবাসন করে শরীর ঠান্ডা করে নিয়ে গোসল করুন।
- ব্যায়াম করার সময় টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলে টয়লেট সেরে ব্যায়াম করুন। পেশাব-পায়খানা চেপে রেখে ব্যায়াম করা উচিত নয়।
- ব্যায়ামের আগে পাঁচ মিনিট হলেও শবাসনে শিথিলায়ন করে মনকে স্থির করে নিয়ে ব্যায়াম শুরু করুন।
- প্রতিদিন ১০/১২টি আসন করতে পারেন।
- প্রাণায়াম বা মুদ্রা খালি পেটে করাই ভালো।
- কোয়ান্টাম ব্যায়াম করার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। শুধুমাত্র প্রাণায়াম ও মুদ্রায় নিয়ম অনুসারে দম নেবেন ও ছাড়বেন।
- কোয়ান্টাম ব্যায়াম যেকোনো সময়ই করা যায়, তবে সকাল বা সন্ধ্যায় করাই ভালো।
- মেয়েদের মাসিক চলাকালে ব্যায়াম করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। মাসিক শেষ হওয়ার একদিন পর ব্যায়াম শুরু করুন।
- সন্তানসম্ভবা হলে সহজ আসন, প্রাণায়াম করা গেলেও মুদ্রা করা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শেই ব্যায়াম করা উচিত।
- সন্তান প্রসবের পর মায়েদের যে রক্তক্ষরণ হয় সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ হলে আবার আস্তে আস্তে ব্যায়াম শুরু করা যেতে পারে।
- সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে বাচ্চা হওয়ার তিন মাস পরেই ব্যায়াম করা যায়। প্রথমে হালকা ব্যায়াম ও পরে আস্তে আস্তে সব ব্যায়ামই করা যাবে, যদি শারীরিক অন্য কোনো সমস্যা না থাকে।

- ☐ স্লপ্ড ডিস্ক, সারভাইকাল বা লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস, চোখের অসুখ, যেমন : রেটিনাল হ্যামারেজ ইত্যাদি রোগে যারা ভুগছেন তারা সামনের দিকে ঝোঁকা (Forward bending) ব্যায়াম করবেন না।
- ☐ পেপটিক আলসারের (গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল) রোগীরা পেটের ওপর চাপ লাগে এমন ব্যায়াম করবেন না। যেমন পশ্চিমোত্তানাসন, জানুশিরাসন ইত্যাদি।
- ☐ যক্ষ্মা, প্লুরিসি, জন্ডিস, কিডনির অসুখ হলে পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ব্যায়াম, আসন বা মুদ্রা করা উচিত নয়।
- ☐ গলব্লাডার, এপেন্ডিক্স, জরায়ুর অপারেশনসহ অন্যান্য বড় ধরনের অপারেশন হলে ছয় মাস পরেই ব্যায়াম করা যায় যদি ডাক্তারের নিষেধ না থাকে।
- ☐ সামনের দিকে ঝোঁকা কয়েকটি ব্যায়ামের পর অবশ্যই পেছনের দিকে ঝোঁকা একটি ব্যায়াম করা উচিত।

বিশেষভাবে লক্ষ করুন

কোনো আসন প্রথমবারেই সঠিক ভঙ্গিমায় জোর করে করার চেষ্টা করবেন না। সহজভাবে যতটুকু পারেন, ততটুকুই করুন। ধীরে ধীরে শরীর নমনীয় হয়ে উঠলে ভঙ্গিমাও ঠিক হয়ে যাবে। তা না হলে হঠাৎ করে শরীরের কোনো জায়গায় টান পড়তে পারে কিংবা মেরুদণ্ডে, ঘাড়ে, কোমরে টান লেগে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রতিটি আসন করতে গিয়ে অতিরিক্ত জোর না খাটিয়ে বরং আপনি যতটুকু পারছেন, ততটুকুই করুন।

হৃদরোগীদের জন্যে উপকারী ব্যায়ামসমূহ

কোয়ান্টাম ব্যায়াম হচ্ছে মনোদৈহিক ব্যায়াম। ব্যায়ামের সময় নির্দিষ্ট অঙ্গের সুস্থতার মনছবি শরীরের সাথে মনের শক্তির সংযোগ সাধন করে। এর ফলে চর্চাকারী দ্বিগুণ ফল লাভ করে থাকেন।

□ উজ্জীবন

ব্যায়াম শুরু করার পূর্বে প্রথমেই শরীরটাকে উজ্জীবিত করা বা 'ওয়ার্ম-আপ' করে নেয়া ভালো। দেহকে একটু উজ্জীবিত করে নিলে দেহ নমনীয় হবে এবং পরবর্তী আসনগুলো করা সহজ হবে। ১৫ ধাপে বিভক্ত এই অনুশীলনীর মাধ্যমে আপনার পেশি ও জয়েন্টের জড়তা কেটে যাবে এবং আপনার শরীর ব্যায়াম ও আসনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠবে। যেকোনো ব্যায়ামের আগেই একটু ওয়ার্ম-আপ (warm-up) প্রয়োজন। এই ১৫ ধাপের অনুশীলন শরীরকে চমৎকারভাবে ওয়ার্ম-আপ করে বলেই একে 'উজ্জীবন' বলা হয়। এই অনুশীলনকালে দম স্বাভাবিক থাকবে।

উজ্জীবন : ছবি– ১

উজ্জীবনের ১৫ ধাপ

পদ্ধতি : দুপায়ের মাঝখানে চার আঙুল ফাঁক রেখে দুহাত শরীরের দুপাশে রেখে বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

১. বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দুহাত সোজা ওপরে তুলুন। খেয়াল রাখুন আপনার শরীরের ওজন যেন দুপায়ের ওপর সমানভাবে পড়ে। কোনো দিকে কাত হবেন না বা কোনো পায়ে ভর বেশি দেবেন না।

২. ধীরে ধীরে হাত ও মাথা পেছন দিকে নিতে থাকুন। কোমর থেকে মেরুদণ্ড পেছন দিকে বেঁকে যাবে। হাঁটু ভাঙবে না। পা সোজা থাকবে। ঘাড় থাকবে শিথিল। যতদূর সম্ভব শরীর পেছন দিকে বাঁকিয়ে দিন।

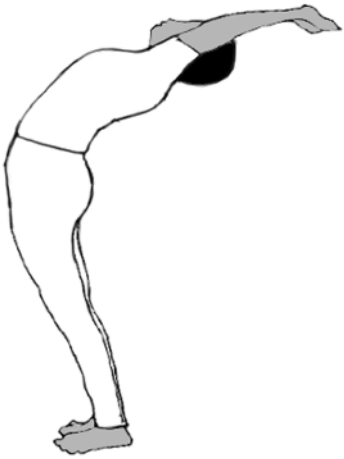

উজ্জীবন : ছবি– ২

৩. পুরো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ুন। কপাল যতদূর সম্ভব হাঁটুর কাছাকাছি নিয়ে আসুন। হাতের আঙুল মেঝে স্পর্শ করবে।

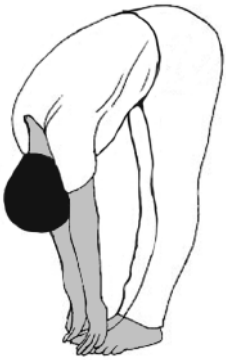

উজ্জীবন : ছবি– ৩

৪. হাঁটু ভেঙে কোমর ও মাথা মাটির সমান্তরালে নিয়ে আসুন। হাতের আঙুল ও করতল এবার সুন্দরভাবে মেঝে স্পর্শ করবে। হাতের ওপর কিছুটা ওজন থাকবে।

উজ্জীবন : ছবি– ৪

৫. দুহাতের ওপর ভর দিয়ে প্রথমে ডান পা পেছন দিকে নিন।

উজ্জীবন : ছবি– ৫

৬. বাম পা-ও পেছন দিকে নিন। পুরো শরীরের ওজন হাত ও পায়ের আঙুলের ওপর পড়বে। মাথা ও কোমর মেঝের সমান্তরাল থাকবে।

উজ্জীবন : ছবি– ৬

৭. পা ও ঊরু মাটির সাথে লেগে থাকবে। কোমর থেকে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে হাতে ভর দিয়ে মাথা যতদূর সম্ভব পেছন দিকে নিয়ে যান।

উজ্জীবন : ছবি– ৭

৮. সমস্ত শরীর মেঝেতে লাগিয়ে দিন। পা হাঁটু পেট বুক কপাল– সব মেঝেতে লেগে যাবে, হাত দুটো থাকবে মাথার দুপাশে।

উজ্জীবন : ছবি– ৮

৯. হাতের ওপর ভর দিয়ে আবার মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে দিন। হাঁটু জোড়া লেগে থাকবে। (৭নং অবস্থানের মতো)

উজ্জীবন : ছবি– ৯

১০. আগের মতো দুহাত ও দুপায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে কোমর ও মাথা মাটির সমান্তরাল রাখুন। (৬নং অবস্থানের মতো)

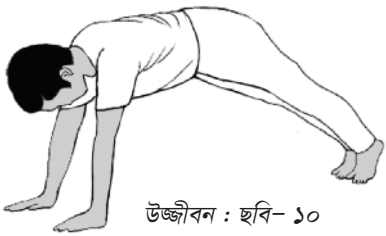

উজ্জীবন : ছবি– ১০

১১. প্রথমে ডান পা হাতের সামনে আনুন। অন্য পায়ের পাতা পেছনে মাটিতে লাগানো থাকবে। (৫নং অবস্থানের মতো)

উজ্জীবন : ছবি– ১১

১২. হাঁটু ভাঙা অবস্থায় দুহাতের পাশে দুপা রাখুন। কোমর ও মাথা মেঝের সমান্তরাল থাকবে। (৪নং অবস্থানের মতো)

উজ্জীবন : ছবি– ১২

১৩. দুপায়ের ওপর ওজন রেখে হাঁটু সোজা করুন। কপাল হাঁটুর কাছাকাছি থাকবে। হাতের আঙুল মাটি স্পর্শ করবে। (৩নং অবস্থানের মতো)

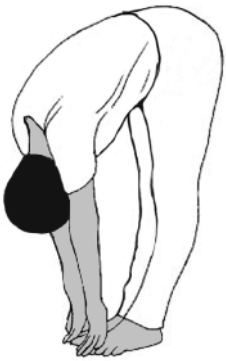

উজ্জীবন : ছবি– ১৩

১৪. হাঁটুর কাছ থেকে মাথা উঠিয়ে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে একেবারে পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে দিন। হাত দুটো মাথার পেছনে থাকবে। (২নং অবস্থানের মতো)

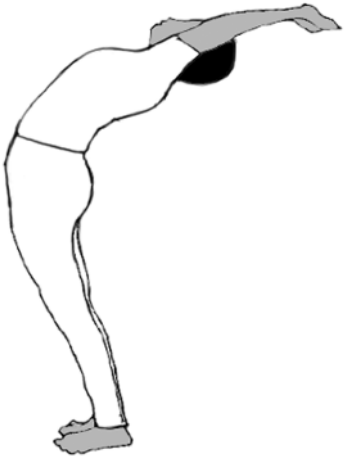

উজ্জীবন : ছবি– ১৪

১৫. এবার বুক টান করে হাত সোজা ওপরের দিকে আনুন। (১নং অবস্থানের মতো)

এবার দুহাত শরীরের দুপাশে রাখুন। আরাম করে দাঁড়ান। এভাবে ৫ থেকে ১০ বার করতে পারেন।

উজ্জীবন : ছবি– ১৫

সতর্কতা

যাদের বাইপাস সার্জারি হয়েছে এবং যারা বিভিন্ন কারণে ব্যাক পেইনে ভুগছেন, তারা উজ্জীবন করা থেকে বিরত থাকুন।

☐ ভুজঙ্গাসন

ভুজঙ্গাসন : ছবি– ১

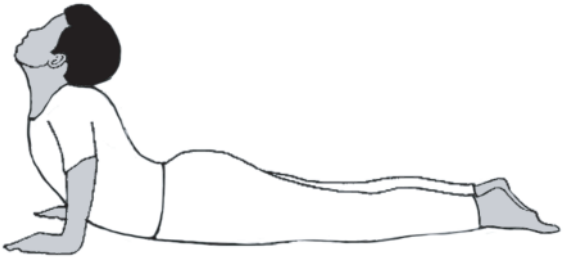

ভুজঙ্গাসন : ছবি– ২

পদ্ধতি : প্রথমে উপুড় হয়ে দুই পা জোড় করে সোজা রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। মাথাটা বামে অথবা ডানে–যেদিকে ইচ্ছে কাত করে রাখুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে ও হাতের পাতা মাটিতে লেগে থাকবে।

এবার (১নং ছবির মতো) হাত দুটো টেনে নিয়ে এসে দুবাহু বরাবর উপুড় করে রাখুন। হাতের ওপর ভর করে মাথা ওপরে তুলুন। বুক মাটি থেকে ওপরে উঠবে। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পা জোড় অবস্থায় সোজা থাকবে। নাভি মেঝেতে লেগে থাকবে। দম থাকবে স্বাভাবিক। (২নং ছবির মতো) এভাবে পূর্ণ ভঙ্গিমায় এসে ১০/১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। ভুজঙ্গ অর্থ সাপ। সাপের ফনার মতো দেখতে লাগে বলে আসনটির নাম ভুজঙ্গাসন।

প্রথমদিকে পা জোড় অবস্থায় আসনটি না করতে পারলে পা দুটো সুবিধা মতো ফাঁক করে অভ্যাস করতে পারেন। ধীরে ধীরে শরীর নমনীয় হয়ে এলে পরে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি করতে পারবেন। জোর করে একবারে করতে যাবেন না।

অন্যান্য উপকারিতা

১. উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্যে এ আসনটি খুবই উপকারী। মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনার ফলে আমাদের শরীরের রক্তে এড্রিনালিন বেড়ে গিয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এ আসন নিয়মিত চর্চা এড্রিনাল গ্রন্থিকে ত্রুটিমুক্ত ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

২. যেসব ছেলে-মেয়ের বয়স অনুযায়ী বুকের গড়ন সরু বা অপরিণত তাদের এ আসনটি করা উচিত। নিয়মিত অভ্যাসে বুক সুগঠিত হয়।

৩. আসনটিতে ঘাড় গলা মুখ বুক পিঠ কোমর ও মেরুদণ্ডের ওপরে চাপ পড়ায় ঐ অঞ্চলের স্নায়ুতন্ত্রী ও পেশি সতেজ ও সক্রিয় থাকে। পিঠের মাংসপেশিকে মজবুত ও বেশি কর্মক্ষম করে।

৪. মেরুদণ্ডের হাড় নমনীয় থাকে।

৫. টনসিলের সমস্যা থেকে মুক্তির জন্যে এবং যারা ঘন ঘন ঠান্ডায় ভোগেন তাদের জন্যে উপকারী।

৬. এ আসনটি নিয়মিত করলে স্পন্ডিলাইটিস, স্লিপ্‌ড ডিস্ক জাতীয় রোগ হতে পারে না।

৭. নিয়মিত এ আসন করলে হজমশক্তি বাড়ে। যকৃৎ ও প্লীহা সুস্থ থাকে।

৮. সব ধরনের স্ত্রীরোগের মহৌষধ হিসেবে কাজ করে। তাই প্রতিদিন এ আসনটি অভ্যাস করা উচিত।

□ অর্ধ-শলভাসন ও পূর্ণ-শলভাসন

পদ্ধতি : প্রথমে উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের সাথে দুপাশে লাগিয়ে রাখুন। এবার মেঝেতে হাতের তালু লাগিয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ করুন। থুতনি মেঝেতে লেগে থাকবে।

এবার দম স্বাভাবিক রেখে প্রথমে ডান পা সোজা রেখে হাঁটু না ভেঙে ওপরের দিকে তুলুন। বাম পা মাটিতে লেগে থাকবে। খেয়াল রাখুন পা যেন ডানে/ বামে বেঁকে না যায়। সোজা ওপরে তুলতে হবে। এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। একই পদ্ধতিতে এরপর বাম পা তুলে ডান পা মাটিতে রেখে করুন। একবার ডান পা ও একবার বাম পা মিলে এক প্রস্থ হয়। এভাবে তিন/ পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন। এভাবে আলাদা আলাদাভাবে দুই পা তুলে অভ্যাস হলে পরে একই সাথে (২নং ছবির মতো)

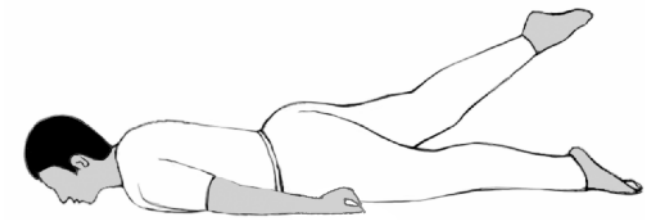

অর্ধ-শলভাসন : ছবি-১

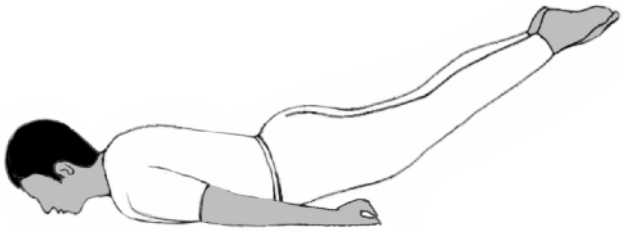

পূর্ণ-শলভাসন : ছবি-২

দুপা একত্রে জোড়া লাগিয়ে হাঁটু না ভেঙে ও মাথা না তুলে করতে পারবেন। একে বলে পূর্ণ শলভাসন।

অন্যান্য উপকারিতা

১. এ আসন নিয়মিত চর্চা করলে কোমরে ব্যথা, কটিবাত, মাসিকের সময় নিচের পেট ব্যথা ইত্যাদি হতে পারে না। এছাড়া শরীরের নিম্নাংশের খুব ভালো ব্যায়াম হয়।

২. কোমর ও নিচের পেটে চর্বি জমতে পারে না।

৩. স্লিপ্‌ড ডিস্ক, লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস বা জরায়ু উল্টে যাওয়ার কারণে কোমরে যে ব্যথা হয় তার বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৪. নিতম্ব ও পিঠের মাংসপেশি মজবুত ও সুদৃঢ় করে ধরে রাখতে সাহায্য করে। যার ফলে স্লিপ্‌ড ডিস্ক হতে পারে না। এছাড়াও স্লিপ্‌ড ডিস্ক থেকে যে সায়াটিকার ব্যথা হয়, এ আসন নিয়মিত চর্চা করলে তার উপশম হয়।

পবনমুক্তাসন : ছবি– ১

☐ পবনমুক্তাসন

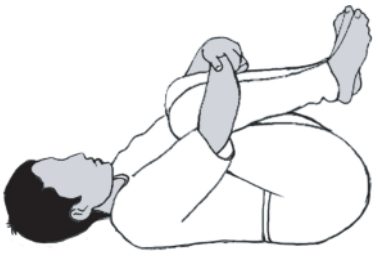

পবনমুক্তাসন : ছবি– ২

পদ্ধতি : প্রথমে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার দম স্বাভাবিক রেখে প্রথমে ডান পা তুলে হাঁটুর কাছে ভাঁজ করে বুকের কাছে এনে দুহাত দিয়ে চেপে ধরুন। ঊরু পেটের সাথে লেগে থাকবে (১নং ছবির মতো)। যদি পেটে চাপ না পড়ে অর্থাৎ ঊরু সঠিকভাবে লাগতে না চায় তাহলে একটা তোয়ালে ভাঁজ করে পেটের ওপর রেখে দিন। তাহলে সহজে চাপ লাগবে। কয়েক দিন অনুশীলন করার পর এমনিতেই হাঁটু বুকের কাছে লাগবে।

এভাবে (ছবির মতো) প্রথমে ডান পা বুকের সাথে লাগিয়ে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তারপর বাম পা ভাঁজ করে বুকের সাথে লাগান। তারপর দুপা সোজা করে মাটিতে রেখে আবার একত্রে দুপা ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে এসে চেপে ধরুন (২নং ছবির মতো)।

এভাবে প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা, তারপর দুপা একত্রে–এরকম তিন ধাপ মিলে এক প্রস্থ হবে। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন।

বি.দ্র. : *এ আসনটি করার সময় অবশ্যই প্রথমে ডান পা তুলে করবেন। কারণ, যদি প্রথমে বাম পা তুলে করেন তাহলে পেটের মধ্য-কোলনে যে বায়ু জমে আছে তা বের না হয়ে অবরোহী কোলন থেকে আরোহী কোলনে প্রবেশ করবে। ফলে বায়ুর বহির্গমন হবে না। তাই প্রথমেই ডান পা তুলে করতে হবে।*

অন্যান্য উপকারিতা

১. এ আসন করলে পেটের মধ্যে বায়ু জমতে পারে না কিংবা কোনো কারণে বায়ু হলে তা নির্গমন হয়।

২. হাঁপানির জন্যে উপকারী।

৩. নিয়মিত পবনমুক্তাসন করলে পাকস্থলী, যকৃৎ, প্লীহা বেশি কর্মক্ষম হয়, হজমশক্তি বাড়ে।

☐ গোমুখাসন

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা করে দুপা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসুন। এবার বাম পায়ের হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের নিচ দিয়ে নিয়ে এসে ডান নিতম্বের কাছে নিয়ে রাখুন। বাম পায়ের গোড়ালি ডান নিতম্বের সাথে লেগে থাকবে। তবে যদি না লাগাতে পারেন জোর করে লাগাতে যাবেন না। আস্তে আস্তে অভ্যাস হলে লেগে যাবে।

এবার ডান পা হাঁটু ভেঙে বাম ঊরুর ওপর দিয়ে এনে এমনভাবে রাখুন যাতে বাম নিতম্বের সাথে ডান পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করে। পায়ের পাতার পিঠ মাটিতে বিছানো থাকবে (১নং ছবি দেখুন)। এবার ডান হাত ডান কাঁধের ওপর নিয়ে এসে যতদূর পারেন পিঠের ওপর রাখুন। হাতের পাতা উপুড় অবস্থায় পিঠের ওপর থাকবে। এবার বাম হাত কোমরের কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে পিঠের ওপর রাখা ডান হাতটি ধরতে চেষ্টা করুন (২নং

গোমুখাসন : ছবি– ১

গোমুখাসন : ছবি– ২

ছবির মতো)। ডান হাত দিয়ে বাম হাত আটকে ধরুন। এ আসনে যে দিকের পা ওপরে থাকবে সে দিকের হাত কাঁধের ওপরে থাকবে, হাত কানের সাথে লেগে থাকবে। অর্থাৎ বাম পা ওপরে থাকলে বাম হাত কাঁধের ওপর থাকবে। ডান পা ওপরে থাকলে ডান হাত কাঁধের ওপর থাকবে। মেরুদণ্ড ও শরীর সবসময় সোজা থাকবে। সামনে বা পেছনে, ডানে বা বামে যেন বেঁকে না যায়। দম স্বাভাবিক রেখে ডান পা ওপরে রাখা অবস্থায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। আবার বাম পা ওপরে রাখা অবস্থায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে ডানে-বামে মিলে এক প্রস্থ হবে। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন। পরে অভ্যাস হলে একবারেই এক পাশে এক থেকে তিন মিনিট করতে পারেন। আর যদি ২০ সেকেন্ডও হাত ধরে রাখতে না পারেন অসুবিধে নেই। যতটুকু সহজভাবে পারেন করুন। তাতেও ফল হবে। নিয়মিত চর্চা করলে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি অনেকক্ষণ করতে পারবেন। এক হাঁটুর ওপর অন্য হাঁটু এমনভাবে থাকে–দেখতে গরুর মুখের মতো দেখায়, তাই এ আসনের নাম গোমুখাসন।

অন্যান্য উপকারিতা

১. এ আসনে মানসিক ও স্নায়বিক উত্তেজনা দূর হয়।

২. নিয়মিত এ আসনটি অভ্যাস করলে হাঁটুতে বাতব্যথা ও বাতজনিত রোগ হতে পারে না। হাত ও কাঁধের সন্ধিস্থলের জন্যে বিশেষ উপকারী।

৩. যারা ফ্রোজেন শোলডারে ভুগছেন অর্থাৎ হাত ওপরে তুলতে পারেন না তাদের জন্যে এ আসন বিশেষ উপকারী।

৪. নিয়মিত এ আসন করলে অর্শ, বাত, সায়াটিকা, মূত্রদাহ হতে পারে না।

৫. যারা অনেকক্ষণ কাজ করতে করতে কাঁধের কাছে ব্যথা অনুভব করেন এবং চিনচিন ব্যথা করে, তারা নিয়মিত এ আসন করলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

৬. রাতে যাদের ভালো ঘুম হয় না তারা রাতে খাবারের পরে বজ্রাসন করে ঘুমানোর আগে এ আসন নিয়মিত করলে অনিদ্রা দূর হয়।

৭. এ আসন নিয়মিত অনুশীলন করলে কোনো স্ত্রীরোগ হতে পারে না এবং যৌন সংযম বজায় রাখা সহজ হয়।

☐ উষ্ট্রাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুহাঁটুর ওপর ভর করে (১নং ছবির মতো) দাঁড়ান। দুহাঁটুসহ দুপা লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাটির সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার দম স্বাভাবিক রেখে দুহাত দিয়ে দুপায়ের গোড়ালি ধরুন। বুক ও পেট যতটা সম্ভব সামনের দিকে এবং ঘাড় ও মাথা পেছন দিকে বাঁকিয়ে ধনুকের মতো করুন। এ অবস্থায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তারপর আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন।

উষ্ট্রাসন : ছবি– ১

উষ্ট্রাসন : ছবি– ২

তবে মনে রাখবেন–যদি প্রথম অবস্থায় পা জোড়া লাগিয়ে না করতে পারেন তাহলে দুহাঁটু, পা ফাঁকা করে করলে সহজে করতে পারবেন। দুহাত একত্রে গোড়ালির ওপর না রাখতে পারলে এক হাত দিয়ে ধরুন, অন্য হাত দিয়ে খাটের পাশে করলে খাট ধরুন কিংবা দেয়াল ধরে করুন। এভাবে হাত পাল্টে একবার ডান হাত দিয়ে ডান পা আবার বাম হাত দিয়ে বাম পা ধরতে চেষ্টা করুন। এভাবে কিছুদিন অভ্যাস করলে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি করতে পারবেন। এ আসনটিতে শরীরের মধ্যভাগ উটের মতো উঁচু হয়ে থাকে বলে একে উষ্ট্রাসন বলা হয়।

অন্যান্য উপকারিতা

১. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ও টনসিল সুস্থ এবং সক্রিয় রাখে। এড্রিনাল গ্রন্থিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত চলাচল করিয়ে তাদের সুস্থ ও কর্মক্ষম করতে সাহায্য করে।

২. যারা কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভুগছেন তারা প্রতিদিন ভোরে ২–৪ গ্লাস পানি খেয়ে উষ্ট্রাসন নিয়মিত অভ্যাস করলে বিশেষ উপকার পাবেন।

৩. উষ্ট্রাসন নিয়মিত অভ্যাস করলে পেটে চর্বি জমতে পারে না। চর্বি থাকলে কমিয়ে কোমর ও পেট সুন্দর-সুশ্রী করে।

৪. শরীরে গরম-ঠান্ডা লাগার সহ্যশক্তি বাড়ায়।

বি.দ্র. : *যারা হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগে ভুগছেন তারা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এ আসনটি করবেন না।*

☐ বজ্রাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুহাঁটু ভেঙে দুপায়ের পাতা পেছন দিকে চিৎ হয়ে মাটির সাথে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিতম্ব দুপায়ের গোড়ালির ওপর রেখে বসুন, যেন দুহাঁটু জোড়া লেগে থাকে। এবার দুহাত টানটান করে হাতের পাতা এবং আঙুলগুলো সোজা রেখে হাঁটুর ওপর উপুড় করে রাখুন। এভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে বসে থাকুন। প্রথম দিকে পায়ে টান অনুভব করতে পারেন। বেশি চাপ বা ব্যথা অনুভব করলে পা সোজা করে একটু বিরতি দিন। তারপর আবার পা ভাঁজ করে আসনে বসুন। যখন সহজে করতে পারবেন তখন ইচ্ছে করলে ১০ থেকে ৩০ মিনিট আপনি বজ্রাসনে বসে থাকতে পারেন।

বজ্রাসন

অন্যান্য উপকারিতা

১. হাঁটুতে ইউরিক এসিড জমে হাঁটু ও ছোট ছোট অস্থিসন্ধিস্থলে বাতজনিত কোনো ব্যথা থাকলে নিয়মিত বজ্রাসনে তা দূর হয়ে পা-কে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

২. তিনবেলা খাবারের পর পরই বজ্রাসনে বসলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩. বজ্রাসনে বসে প্রতিদিন ১০০ বার চুল ব্রাশ করলে সহজে চুল পাকে না এবং চুল পড়াও কমে যায়।

৪. দেহের নিচের অংশ সুগঠিত করতে বজ্রাসন খুবই সহায়ক।

৫. এছাড়া রাতে খাবারের পর বজ্রাসনের অভ্যাস করলে হজমশক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সুনিদ্রা আসতে সাহায্য করে।

বি.দ্র.: *মনে রাখতে হবে, কোনো আসনই জোর করে একবারে সঠিক ভঙ্গিমায় করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। ধীরে ধীরে সঠিক ভঙ্গিমায় নিয়ে আসুন।*

☐ পদ্মাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুপা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসুন। এবার হাত দিয়ে ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ করে বাম পায়ের ঊরুর ওপর রাখুন। তারপর বাম পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে একই নিয়মে ডান ঊরুর ওপর রাখুন এবং দুই পায়ের গোড়ালি দুটো যেন নিচের পেট স্পর্শ করে (২নং ছবির মতো)।

হাত দুটো দুই হাঁটুর ওপর রাখুন। হাতের তালু ওপরের দিকে থাকবে এবং হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী (ছবির মতো) ধরে রাখুন। মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। সঠিক অবস্থায় বসে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম নিন (বুক ফুলিয়ে)। এরপর দম পাঁচ/ সাত সেকেন্ড ধরে ছাড়ুন। ছাড়ার সময় আপনার পেট ভেতরের দিকে বসে যাবে। অর্থাৎ দম নিন বুকে, ছাড়ুন সম্পূর্ণরূপে এবং দম নেয়ার চেয়ে ছাড়ার সময় একটু বেশি নিন।

এভাবে এক থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত পদ্মাসনে বসে প্রাণায়াম করতে পারেন। প্রয়োজনে পা অদল-বদল করে নিতে পারেন। যত দিন সহজে করতে অভ্যস্ত না হন ততদিন প্রথমে সহজ পদ্মাসনে অর্থাৎ এক পায়ে করে অভ্যাস করুন (১নং ছবির মতো)। মনে রাখবেন–অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত

সহজ পদ্মাসন : ছবি-১

পদ্মাসন : ছবি-২

কোনো আসন জোর করে করবেন না। নিয়মিত করলে ধীরে ধীরে সঠিকভাবে করতে পারবেন।

অন্যান্য উপকারিতা

১. মনোসংযোগ বৃদ্ধি পায়, মন স্থির হয়। মুখের ত্বক সুন্দর থাকে।

২. পায়ের ব্যথা, হাঁটুতে বাত-ব্যথা হতে পারে না।

৩. পদ্মাসনে বসে প্রাণায়াম করলে ফুসফুস ভালো থাকে। ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস করলে হাঁপানি হতে পারে না।

৪. এ আসন করার সময় মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হয় বলে যাদের মেরুদণ্ড একটু বাঁকা ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে আসনটি তাদের জন্যে খুবই উপকারী। এতে মেরুদণ্ড সোজা থাকে এবং মেরুদণ্ড থেকে যেসব স্নায়ু শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে সেগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।

☐ শবাসন

শবাসন

সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন ব্যায়ামের পূর্বে এবং ব্যায়ামের পরে পাঁচ থেকে দশ মিনিট করতে পারেন। শব অর্থ লাশ। অর্থাৎ মৃত বা লাশের মতো পড়ে থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে শরীর পুরোপুরি শিথিল বা নরম করে দেয়া অর্থাৎ হাত-পা পুরোপুরি ছেড়ে দিলে যেমন লাগে সেভাবে আপনি চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিন। তবে দুপায়ের মাঝে এক হাত পরিমাণ ফাঁক রাখলে ভালো। হাত দুটো শরীরের দুপাশে ও হাতের তালু ওপরের দিকে রাখুন। এরপর চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে তিন/ চার বার লম্বা দম নিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে নিতে ভাবুন, আপনার শরীর পুরোপুরি শিথিল অর্থাৎ নিস্তেজ হয়ে আছে, বেশ আরাম লাগছে।

এবার কল্পনা করুন, আপনি একটি সুন্দর মনোরম ফুলের বাগানে সবুজ নরম ঘাসের ওপর শুয়ে আছেন। গ্রীষ্মকাল হলে ভাবুন দখিনা বাতাস আপনার শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে আর শীতকাল হলে ভাবুন ঈষদুষ্ণ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। বেশ আরাম আরাম লাগছে। এ সময় মন থেকে সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিন। কল্পনার রাজ্যে কিছুক্ষণ বিচরণ করুন। শবাসন করাকালে বিশ্বাসের সাথে ভাবুন আপনার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনার খুব আরাম লাগছে। এভাবে ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেলেও ক্ষতি নেই।

সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন উপুড় হয়ে শুয়েও করতে পারেন। তবে ব্যায়াম চলাকালে উপুড় হয়ে ব্যায়াম করার সময় যদি একটু বিশ্রাম নিতে চান তখন উপুড় হয়ে এক মিনিট শবাসন করতে পারেন। সাধারণভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে শবাসন বা সহজ শিথিলায়ন করবেন।

অন্যান্য উপকারিতা

১. ব্যায়ামের পর সহজ শিথিলায়নে দেহ-মন উভয়ই বিশ্রাম পায়। সহজ শিথিলায়নের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, আমরা যখন দাঁড়িয়ে বা বসে থাকি তখন শরীরের ওপরের অংশে রক্ত চলাচল চালু রাখতে হৃৎপিণ্ডকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। কিন্তু সহজ শিথিলায়নের সময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব শরীরের সমস্ত অংশের ওপর সমান থাকে বলে রক্ত চলাচল সহজ হয় এবং শরীরের সকল অংশে হৃৎপিণ্ড বেশি পরিশ্রম না করেই রক্ত সরবরাহ করার সুযোগ পায়। ক্লান্তি দূর হয়ে সহজেই সতেজ অনুভূতি চলে আসে।

২. যারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বেশি করেন তাদের জন্যে সহজ শিথিলায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে ক্লান্তিবোধ করলে ১০ মিনিট সহজ শিথিলায়ন করে নিলে পুনরায় পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। গর্ভবতী মায়েদের জন্যে সহজ শিথিলায়ন খুবই উপকারী। তাতে শরীর-মন দুটোই ভালো থাকে।

৮

সুস্থতার আসল রহস্য ॥ কার্যকর রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

বিজ্ঞান যখন আজকের মতো ব্যুৎপত্তি লাভ করে নি, অর্থাৎ সেই সুদূর অতীতে কেউ অসুস্থ হলে মনে করা হতো যে, এটি নিশ্চয়ই তার কোনো অন্যায় বা পাপের ফল অথবা তার গায়ে কোনো খারাপ গন্ধ বা বাতাস লেগেছে কিংবা হয়তো দেবতার অভিশাপ লেগেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে এখন অনেক দুরারোগ্য রোগের কারণ আমরা জানতে পারছি। কিন্তু এরপরও অনেক রোগ আছে, যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান এখনো দিতে পারে নি। বিজ্ঞান সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছে না কেন ডায়াবেটিস হয়। বলতে পারছে না উচ্চ রক্তচাপ কেন হয়। এভাবে আরো অনেক রোগ আছে, যার কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞান আজও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি।

শুধু কি তাই, প্রায় প্রতিমুহূর্তে আমাদের শরীরে কত ধরনের জীবাণু প্রবেশ করছে, কিন্তু তাই বলে আমরা প্রতিদিন অসুস্থ হয়ে পড়ছি না। ধরুন, আপনারা তিন বন্ধু বা বান্ধবী একদিন রাস্তার পাশের কোনো হোটেলে খেতে ঢুকলেন। তৃপ্তি করে খেলেন।

এসব হোটেলের বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে খাবার কখনো ঢাকা থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই খাবারে প্রচুর মাছি বসে। আর মাছির বৈশিষ্ট্য হলো মাছি যা খায় ২৪ ঘণ্টা তা বমি করে, উপরন্তু মাছির হাত-পায়ে লেগে থাকা ময়লা তো আছেই। যা-ই হোক, বাসায় ফেরার ঘণ্টাখানেক পর এক বন্ধু ফোন করে জানালো, দোস্ত, আমার তো খবর হয়ে গেছে, টয়লেটে যাওয়া-আসা করছি আর ওরস্যালাইন খাচ্ছি। অর্থাৎ ডায়রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আপনি ভাবলেন, দেখি তো আরেক বন্ধুর কী অবস্থা। আপনি ঐ বন্ধুকে ফোন করে বললেন যে, অমুকের এই অবস্থা, তোমার খবর কী? সে জানালো, সে এখন পর্যন্ত ভালো আছে।

একই খাবার তিনজনে খেলেন। একজন অসুস্থ হলো, কিন্তু অন্য দুজনের কিছুই হলো না। এর কারণ কী? এর পেছনের মূল ফ্যাক্টরটি হচ্ছে আপনাদের দেহের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা আপনাদের দুজনকে সুস্থ রাখার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের সুস্থ রাখে

বাইরের কিংবা ভেতরের শত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেহ-সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যেও স্রষ্টা তেমনি একটি সুসংহত ও কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর সেটিই হচ্ছে ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

আমাদের রক্তের মধ্যে তিন ধরনের সেল বা কোষ রয়েছে–লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা ও অণুচক্রিকা। লোহিত কণিকার কাজ হলো, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহন করা। অণুচক্রিকার কাজ হলো, কোনো জায়গা কেটে গেলে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করা, যাতে অতিরিক্ত রক্তরক্ষণ হতে না পারে। শ্বেতকণিকার কাজ হলো, দেহের রোগ প্রতিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সহায়তা করা। মূলত শ্বেতকণিকাই হলো আমাদের দেহের আসল প্রতিরক্ষা বাহিনী।

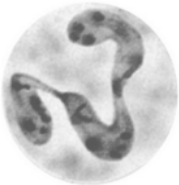

নিউট্রোফিল

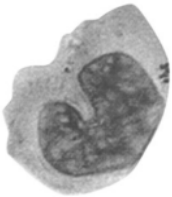

মনোসাইট

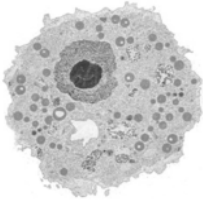

ম্যাক্রোফেজ

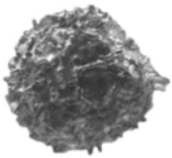

ন্যাচারাল কিলার সেল

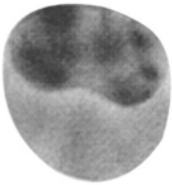

লিম্ফোসাইট

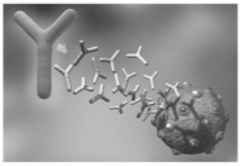

এন্টিবডি

যেসব শ্বেতকণিকা রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশ নেয় সেগুলো হলো নিউট্রোফিল, মনোসাইট, ম্যাক্রোফেজ, বি-লিম্ফোসাইট, টি-লিম্ফোসাইট ইত্যাদি। শরীরে কোনো জীবাণু প্রবেশ করার সাথে সাথে এরা সেগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়।

এছাড়াও আছে ন্যাচারাল কিলার সেল। নামেই এর পরিচয়। আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত ক্যান্সার সেল তৈরি হচ্ছে; কিন্তু টিউমারে রূপ নেয়ার পূর্বেই ন্যাচারাল কিলার সেল সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়।

ইমিউন সিস্টেম কাজ করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে

আমাদের ইমিউন সিস্টেম মূলত কাজ করে স্বয়ংক্রিয় ও স্বনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। ধরুন, মাঠে কাজ করতে গিয়ে একজনের হাত কেটে গেল। হাত কেটে গেলে আমরা কেউ কেউ থুতু দিয়ে বা দুর্বাঘাস চিবিয়ে তাতে লাগিয়ে দিই। ভালো হয়ে গেলে মনে করি, এটা আমাদের থুতু কিংবা দুর্বাঘাসেরই কৃতিত্ব।

কিন্তু আসলে কী ঘটে? যখন হাত কেটে যায় তখন কাটা অংশ দিয়ে অনেক জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। সেগুলোকে ধরে ফেলার জন্যে সাথে সাথেই তখন সেখানে ছুটে যায় নিউট্রোফিল এবং সেগুলোকে ধ্বংস করে।

আপনার নিউট্রোফিল অযাচিত জীবাণু ধরে ধরে খেয়ে নিচ্ছে, জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখছে। আবার যখন নিউট্রোফিল যুদ্ধে পরাজিত হয়, তখনই আপনার ইনফেকশন হয়। সাদা রঙের পুঁজ বেরিয়ে আসে। এই পুঁজ কিন্তু আপনার শরীরের মৃত নিউট্রোফিল। আপনাকে সুস্থ রাখার জন্যে এভাবে প্রতিদিন কত শত সহস্র নিউট্রোফিল অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে আপনি কিন্তু তা জানেন না।

এত শক্তিশালী ও কার্যকরী আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরক্ষা বাহিনী, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা–বিদেশি ডাক্তার, বহুজাতিক কোম্পানির চড়া দামের ওষুধ আর ফাইভস্টার হাসপাতাল ছাড়া আমাদের পক্ষে সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। আসলেই কি তাই? আসুন দেখা যাক।

পরিবারে যখন নতুন শিশু আসে তখন আমরা তাকে টিকা বা ভ্যাকসিন দিই। প্রথম যে টিকাটি দেয়া হয় সেটি হলো বিসিজি, যা শিশুকে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা দেয়। এই বিসিজি ভ্যাকসিন বিজ্ঞানীরা কীভাবে তৈরি করেন? বিজ্ঞানীরা যক্ষ্মার জীবাণু সংগ্রহ করে সেটির রোগ তৈরি করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেন। তারপর ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটানো

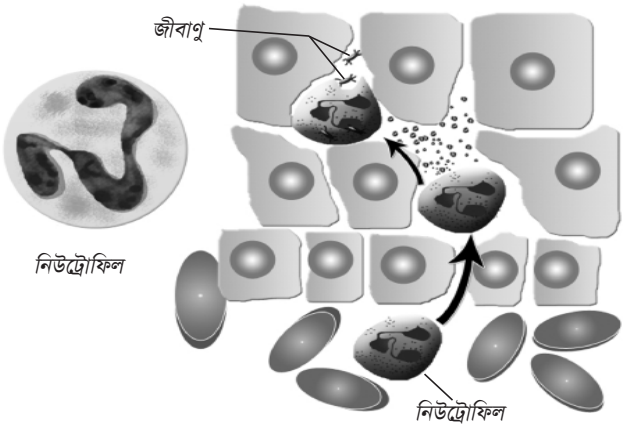

শরীরে ঢুকে পড়া অনাকাঙ্ক্ষিত জীবাণুকে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে নিউট্রোফিল

হয়। একপর্যায়ে কিছু জীবাণু ছোট ছোট শিশিতে ভরে আপনার বাড়ির কাছের হাসপাতালে বা মেডিকেল সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আপনি আপনার সন্তানকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন, আর নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মী সিরিঞ্জ দিয়ে এই যক্ষ্মার জীবাণু (!) আপনার সন্তানের শরীরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আপনি খুশি মনে বাসায় চলে এলেন যে, আপনার সন্তান এখন যক্ষ্মা থেকে সুরক্ষিত।

এখানে মূল ঘটনাটা কী ঘটছে? যক্ষ্মার জীবাণু শরীরে ঢোকা মাত্রই আপনার শিশুর প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্যতম সৈনিক ম্যাক্রোফেজ সেখানে ছুটে যায়, জীবাণুটিকে কামড়ে ধরে, কামড় দিয়ে বুঝতে পারে যে তাকে ধ্বংস করা তার সাধ্যের মধ্যে নেই। কিন্তু হাল ছেড়ে না দিয়ে ম্যাক্রোফেজ তাকে নিয়ে আসে টি-লিম্ফোসাইটের কাছে।

শেষ পর্যন্ত এই টি-লিম্ফোসাইট সেই জীবাণুকে ধ্বংস করে। সেইসাথে হাজার হাজার মেমোরি টি-সেল তৈরি করে রক্তে ছেড়ে দেয়। ভবিষ্যৎ জীবনে যখন সত্যি সত্যিই যক্ষ্মার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে তখন এই মেমোরি টি-সেল সেই জীবাণুকে আক্রমণ করে এবং একই প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করে। অর্থাৎ যক্ষ্মা থেকে আপনার শিশুকে রক্ষা করছে কিন্তু তার শরীরের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ভ্যাকসিন বা টিকা এক্ষেত্রে শুধু সাহায্য করছে মাত্র।

এভাবে হেপাটাইটিস, হাম, পোলিও এবং এ জাতীয় অন্যান্য রোগব্যাধি থেকেও রক্ষা করছে আপনার শরীরের নিজস্ব ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ভ্যাকসিন এ প্রক্রিয়াটিকে সক্রিয় করে তুলছে মাত্র।

চাই সুস্থ ও কার্যকর রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

শরীরকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখতে ইমিউন সিস্টেমকে সুস্থ রাখা জরুরি। বিষয়টিকে আমরা একটু অন্যভাবেও বোঝার চেষ্টা করতে পারি। বর্তমানে সারা বিশ্বে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী রোগটি হলো এইডস (AIDS, Acquired Immuno deficiency Syndrome). অর্থাৎ এইডস হলে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ধসে পড়ে।

এইডস রোগের ভাইরাস এইচআইভি (HIV, Human Immuno deficiency Virus) শরীরে ঢোকার পর টি-লিম্ফোসাইটের ভেতরে বাসা বাঁধে। সেখানে সে বংশবিস্তার করে। একসময় টি-লিম্ফোসাইটকে অকার্যকর করে দেয়। তখন শরীরের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে পড়ে।

এ অবস্থায় অর্থাৎ এইডস নিয়েও একজন মানুষ অনেক বছর সুস্থভাবে বাঁচতে পারে, যদি না সে অন্য রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন অন্য কোনো জীবাণু তার শরীরে প্রবেশ করে। যেমন, যক্ষ্মার জীবাণু। সাধারণভাবে একজন মানুষের যক্ষ্মা হলে যক্ষ্মারোধী ওষুধ সেবন করে তিনি ছয় থেকে নয় মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে যান। কিন্তু এইডস রোগীর যক্ষ্মা হলে তাকে যক্ষ্মারোধী ওষুধ দিয়েও সুস্থ করা যায় না। দেখা যায়, সে রোগী শেষপর্যন্ত যক্ষ্মাতেই মারা যায়। নিউমোনিয়াতেও তা-ই। সাধারণ রোগীর ক্ষেত্রে প্রচলিত চিকিৎসায় নিউমোনিয়া সেরে যাবে, কিন্তু এইডস-আক্রান্ত রোগী হলে তিনি সহজে সুস্থ হবেন না।

এখনকার সময়ে মানুষ বাঁচে বড়জোর ১০০ থেকে ১২০ বছর। এত অত্যাধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা সত্ত্বেও এর বেশি বাঁচার রেকর্ড বর্তমান যুগে বিরল। কিন্তু আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখবো, কোরআনে বর্ণিত আছে, হযরত নূহ (আ) বেঁচে ছিলেন ৫০ কম হাজার বছর। অর্থাৎ ৯৫০ বছর। তিনি বেঁচে ছিলেন ৯৫০ আর তাঁর সময়ের মানুষজন ৫০/৬০ বছর বাঁচতেন, এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং, তারাও নিশ্চয়ই কেউ ৯০০ বছর, কেউ-বা হয়তো এর বেশিও বাঁচতেন।

এখন প্রশ্ন হলো, সে সময় কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তারা দেখাতেন কিংবা কোন দামি ওষুধ আর এন্টিবায়োটিক তারা খেতেন, কোন বিদেশি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যেতেন তারা? এন্টিবায়োটিকের ইতিহাসই-বা কত বছরের? প্রথম এন্টিবায়োটিক পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয় ১৯২৮ সালে। সেই অর্থে এন্টিবায়োটিকের বয়স মাত্র ৮৪ বছর। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি, শুধু এককভাবে এন্টিবায়োটিক কাউকে রক্ষা করতে পারে না। বিভিন্ন

ধরনের রোগ-জীবাণু থেকে আমাদেরকে রক্ষা করছে এবং রোগ হলে সারিয়ে তুলছে মূলত আমাদের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আর এখানে সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করছে ডাক্তার, ওষুধ, হাসপাতাল। অর্থাৎ আমাদের সুস্থতার মূল শক্তি হলো একটি কার্যকর রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

মেডিটেশন, ব্যায়াম ও বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস ॥ ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে

আসলে জীবনযাপনের বিজ্ঞান বা সায়েন্স অব লিভিং অনুসরণের মাধ্যমে একজন মানুষ আমৃত্যু সুস্থ থাকতে পারে। আমাদের মুনি-ঋষি-বুজুর্গ ও নবী-রসুলরাই এর বাস্তব উদাহরণ। তাঁরা সুস্থ জীবনাচারে অভ্যস্ত ছিলেন বলে তাঁদের ইমিউন সিস্টেমও সবসময় চমৎকারভাবে কাজ করতো। এবং এভাবেই জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা মানুষকে সেবা ও দুঃখমুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন।

শরীরের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সক্রিয় ও কর্মক্ষম করে তোলার মাধ্যমে আমাদের পক্ষেও সম্ভব সুস্থতার এই শক্তি অর্জন করা। একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মেডিটেশন আপনার এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকেই সজীব ও অধিকতর সক্রিয় করে তোলে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত ক্যান্সার সেল তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তা টিউমারে রূপ নেয়ার আগেই আমাদের ইমিউন সিস্টেম সেগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ক্যান্সার তখনই হয় যখন ইমিউন সিস্টেম নিষ্ক্রিয় বা অবদমিত থাকে এবং প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। আর এটি ঘটে তখনই, যখন ক্রমাগত মানসিক অশান্তি অস্থিরতা ও স্ট্রেসের কারণে ইমিউন সিস্টেমের ওপর থেকে মস্তিষ্ক তার স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ হারায়।

অন্যদিকে, সুখানুভূতি ও মনের প্রশান্ত অবস্থা এবং নিয়মিত মেডিটেশন আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে সংহত করে তোলে। এর কার্যকারিতা বাড়ায়। ব্যায়াম এবং বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাসের ভূমিকাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক খাবার, বিশেষত মৌসুমি ফলমূল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষুদ্রান্ত্র দ্বারা। আর ক্ষুদ্রান্ত্রকে সুস্থ রাখতে পারে এরকম তিনটি খাদ্য হলো–আদা, রসুন ও মধু। এছাড়াও গ্রিন টি বা সবুজ চা-ও রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সংহত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

৯

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে চাই বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস

আমরা দেখেছি, ওষুধ, এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারির মতো ব্যয়বহুল এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতিও হৃদরোগীদের কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারছে না। কিন্তু কেন? এনজিওপ্লাস্টি করার কয়েক বছর, এমনকি কখনো কখনো কয়েক মাসের মধ্যেই কেন রোগীকে আবার বাইপাস সার্জারির প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে কিংবা বাইপাস করার পরও রোগীরা কেন পুনঃব্লকেজে আক্রান্ত হচ্ছেন?

উত্তর একটাই। তা হলো, যেসব কারণে সমস্যার সূত্রপাত এবং ধমনীতে ব্লকেজের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে তার প্রতি যথাযথ দৃষ্টি না দেয়া। প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতাটি এখানেই। তাই সুস্থ জীবনাচার চর্চার মাধ্যমে হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রমে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

মেদস্থূলতা বাড়ায় হৃদরোগের ঝুঁকি ॥ ভুল খাদ্যাভ্যাসই এর অন্যতম কারণ

প্রত্যেক মানুষই তার নিজের মতো আলাদা। প্রত্যেকের নিজস্ব উচ্চতা রয়েছে, এ উচ্চতা অনুযায়ী তার শরীরের একটি বাঞ্ছিত ওজন থাকা প্রয়োজন। একজন মানুষের উচ্চতা ও ওজনের অনুপাত দিয়েই নির্ণয় করা যায়, তিনি স্বাভাবিক ওজন নাকি অতিরিক্ত ওজনের অধিকারী বা স্থূলকায়।

বর্তমানে শিশু-কিশোরদের মধ্যেও মেদস্থূলতার প্রবণতা বাড়ছে। বিশ্বে প্রতি ছয়টি শিশুর মধ্যে গড়ে একজন অতিরিক্ত ওজনের শিকার। খেলাধুলার স্থানাভাবে শিশুরা এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে টিভি বা কম্পিউটারের সামনে। সেইসাথে সফট ড্রিংকস ও ফাস্টফুডের আগ্রাসন তো আছেই। ফলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে চলেছে তাদের ওজন। বাড়ছে প্রাণঘাতী রোগের ঝুঁকি।

উচ্চতা অনুসারে দেহের ওজন সারণি

পুরুষদের জন্যে

ফুট	মিটার	হালকা	মাঝারি	চওড়
		কেজি		
৫′ -১″	১.৫৬	৫১.৮	৫৫.০	৫৯.১
৫′ -২″	১.৫৮	৫৩.৬	৫৬.৮	৬০.৯
৫′ -৩″	১.৬১	৫৫.০	৫৭.৭	৬২.৩
৫′ -৪″	১.৬৩	৫৫.৯	৫৯.৫	৬৩.৬
৫′ -৫″	১.৬৬	৫৭.৩	৬০.৯	৬৭.৭
৫′ -৬″	১.৬৮	৫৯.১	৬২.৩	৬৯.৫
৫′ -৭″	১.৭১	৬০.৯	৬৫.০	৭১.৮
৫′ -৮″	১.৭৩	৬২.৭	৬৬.৮	৭৩.২
৫′ -৯″	১.৭৬	৬৪.৮	৬৮.৬	৭৫.৯
৫′ -১০″	১.৭৮	৬৬.৮	৭০	৭৬.৯
৫′ -১১″	১.৮১	৬৭.৮	৭২	৭৭.৯
৬′	১.৮৪	–	৭৩	৭৮.৭
৬′ -১″	১.৮৬	–	৭৪.৫	৮০.৪
৬′ -২″	১.৮৯	–	৭৬.৬	৮২.৩
৬′ -৩″	১.৯১	–	৮০.৯	৮৬.৪

মহিলাদের জন্যে

ফুট	মিটার	হালকা	মাঝারি	চওড়া
		কেজি		
৪′ -৮″	১.৪২	৪২.৩	৪৫	৪৯.৫
৪′ -৯″	১.৪৪	৪৩.৩	৪৫.৯	৫০.৯
৪′-১০″	১.৪৭	৪৪.৫	৪৭.৭	৫২.২
৪′ -১১″	১.৫০	৪৫.৯	৪৮.৬	৫৩.৬
৫′	১.৫২	৪৬.৮	৪৯.৫	৫৫.০
৫′ -১″	১.৫৬	৪৮.৬	৫০.৯	৫৬.৪
৫′ -২″	১.৫৮	৫০.০	৫২.৭	৫৭.৭
৫′ -৩″	১.৬১	৫০.৯	৫৫.০	৫৯.৫
৫′ -৪″	১.৬৩	৫২.৭	৫৬.৮	৬১.৩
৫′ -৫″	১.৬৬	৫৪.৬	৫৮.৬	৬৫.০
৫′ -৬″	১.৬৮	৫৬.৪	৬০.৫	৬৬.৩
৫′ -৭″	১.৭১	৫৮.৬	৬২.৩	৬৮.৫
৫′ -৮″	১.৭৩	৬০.৫	৬৪.১	৭০.৮
৫′ -৯″	১.৭৬	৬১.৭	৬৫.৯	৭২.৬
৫′ -১০″	১.৭৮	৬৩.১	৬৭.৭	৭৩.৬
৫′ -১১″	১.৮১	৬৪.১	৬৮.৭	৭৪.৬

পৃথিবীর অনেক দেশেই মেদস্থূলতা এখন মহামারিতে রূপ নিয়েছে। বিশ্বের ৭০০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অতিরিক্ত ওজনের শিকার। এর কারণ কী?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বায়ন এবং পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাসই এর অন্যতম কারণ। আগের যুগের মানুষেরা এখনকার তুলনায় অনেক বেশিই হয়তো খেতো কিন্তু এর সাথে সাথে তাদের প্রচুর কায়িক পরিশ্রমও করতে হতো। ফলে যে পরিমাণ ক্যালরি তারা খাবার থেকে গ্রহণ করতেন, তার প্রায় পুরোটাই তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে খরচ হয়ে যেত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ধারায় সে সুযোগ এখন আধুনিক মানুষের জীবনে আর নেই। এখন আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি পরিশ্রমহীন জীবনযাপনে। এখন ঘর থেকে বের হলেই গাড়ি। সিঁড়ি ভাঙার ঝক্কি নেই, আছে লিফ্‌ট। সবমিলিয়ে আমাদের জীবনে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং সুযোগ দুটোই এখন কমে গেছে।

সময় বাঁচাতে মানুষ এখন রেস্টুরেন্টে যাচ্ছে, প্রায়ই ফাস্টফুড ও অতিরিক্ত ভাজাপোড়া চর্বিযুক্ত খাবার খাচ্ছে, বাসায় কিনে নিয়ে যাচ্ছে প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার, যার বেশিরভাগই শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। ফলে হয়ে উঠছে বাড়তি ওজন ও স্থূল দেহের অধিকারী। আর দিনের পর দিন এই কোলেস্টেরল করোনারি ধমনীতে জমে জমে ব্লকেজ তৈরির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে।

অবিদ্যার কারণেও আমরা প্রায়ই আমাদের রসনা ও রিপুকে দমন করতে পারি না। অধিকাংশ পরিবারের খাদ্যতালিকায় প্রায় প্রতিদিনই এখন থাকে অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত ও কোলেস্টেরল-সমৃদ্ধ খাবার। যার ফলে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক ও করোনারি হৃদরোগের মতো জীবনঘাতী রোগগুলোর প্রকোপ বাড়ছে।

অনেকের মধ্যেই একটি ধারণা কাজ করে–এখন খেয়ে নিই, একটা বয়সের পরে গিয়ে খাবার নিয়ন্ত্রণ করবো। কিন্তু সে সুযোগ আপনি যে পাচ্ছেন তার নিশ্চয়তাই-বা কতটুকু?

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক বলেন, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সবচেয়ে কম বয়সী করোনারি হৃদরোগীর বয়স মাত্র ১৩ বছর। তিনি বলেন, ৮/১০ বছর বয়স থেকেই করোনারি ধমনীতে কোলেস্টেরল জমার প্রবণতা শুরু হতে পারে। আর এতে খাদ্যাভ্যাসের ভূমিকা অনেকখানি।

দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস হওয়া চাই সুষম

নৃ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের পূর্ব-পুরুষরা ছিলেন প্রধানত তৃণভোজী। এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে তারা বলছেন, মানুষের দাঁতের গঠন মূলত শাক-সব্জি, ফলমূল ও শস্যদানা জাতীয় খাবারের উপযোগী। শুধু তা-ই নয়, মানব পরিপাকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র এতটাই দীর্ঘ যে, সেটি উদ্ভিদজাত আঁশযুক্ত খাবারের ধীরলয়ের হজম প্রক্রিয়াকেই সমর্থন করে।

গত শতকের শুরুর দিকেও আমেরিকানরা ছিলো প্রধানত ভেজিটেরিয়ান বা তৃণভোজী। তাদের খাদ্যতালিকার দুই-তৃতীয়াংশ প্রোটিন আসতো উদ্ভিদজাত খাবার থেকে। সময়ের সাথে সাথে বদলে গেছে মানুষের সংস্কৃতি আর অভ্যাস। আমেরিকানদের খাদ্যতালিকার দুই-তৃতীয়াংশ প্রোটিন এখন আসে মাছ মাংস ডিম দুধ থেকে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং খাদ্য সংরক্ষণের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারণে তাদের খাবারে প্রাণীজ প্রোটিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে।

মূলত খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের ফলেই পাশ্চাত্যে করোনারি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগগুলোর হার বেড়েছে বহুগুণে। সারা পৃথিবীর চিত্র এখন কমবেশি এটাই। তাই শুধু হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্যেই নয়, বরং সার্বিক সুস্থতার প্রয়োজনেই আমাদের চাই একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস।

প্রতিটি খাবারেই বিভিন্ন অনুপাতে রয়েছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট। আর আমাদের প্রতিদিনের খাবারটাকে তখনই আমরা স্বাস্থ্যকর বলতে পারবো, যখন খাবারে এ তিনটি উপাদান সঠিক অনুপাতে থাকবে।

☐ প্রোটিন বা আমিষ :

প্রোটিন দুধরনের :

- প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন : মাছ মাংস ডিম দুধ সয়াবিন।
- দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন : সব ধরনের ডাল, বাদাম।

প্রতিদিনকার খাবারে আমরা যে প্রোটিন খাই, তা হজম প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় শেষে এমাইনো এসিড হিসেবে রক্তে প্রবেশ করে। এই এমাইনো এসিড শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণসহ নানা শারীরবৃত্তিয় কাজে ব্যবহৃত হয়।

মানবদেহে ২২ ধরনের এমাইনো এসিড রয়েছে। এর মধ্যে ১০টি হলো অতি প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিড (Essential amino acid)। অর্থাৎ প্রতিদিনের খাবার থেকেই এগুলো আমাদের পেতে হবে। একসময় মনে করা

হতো, মাছ মাংস ডিম দুধ–এগুলো খেলেই কেবল এই চাহিদা পূরণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু পুষ্টিবিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, চাল ও ডাল কিংবা রুটি ও ডাল যদি একসাথে খাওয়া হয় তবে এই ১০টি অতি প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিডের চাহিদা সহজেই পূরণ হতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভেজিটেরিয়ান মানেই নিরামিষভোজী নয়, বরং বলা যেতে পারে তৃণভোজী। কেননা, যিনি ডাল দিয়ে ভাত খাচ্ছেন বা খিচুড়ি খাচ্ছেন কিংবা ডাল-রুটি খাচ্ছেন তিনিও তো আমিষ গ্রহণ করছেন। সেটি উদ্ভিদজাত আমিষ। তাই সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে, নিরামিষভোজী বলে আসলে কেউ নেই। কারণ আমরা সহজেই বুঝতে পারছি, মাছ মাংস ডিম দুধ না খেলেই একজন মানুষ নিরামিষভোজী হয়ে যায় না।

☐ কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা :

কার্বোহাইড্রেট প্রধানত দুধরনের :

- Simple carbohydrate : সাদা চাল ও ময়দা চিনি গ্লুকোজ গুড় মিছরি মধু মদ ইত্যাদি।
- Complex carbohydrate : পূর্ণ খাদ্যশস্য (আবরণসহ চাল গম ভুট্টা), সব ধরনের ফল, সব ধরনের সব্জি ইত্যাদি।

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার গ্রহণের পর হজম প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পর্যায়ে এটি গ্লুকোজ বা ফ্রুক্টোজ হিসেবে রক্তে প্রবেশ করে। অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত ইনসুলিন রক্তের এই গ্লুকোজকে ধরে ধরে প্রতিটি কোষে প্রবেশ করায় এবং প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন করে।

Simple carbohydrate অর্থাৎ সাদা চাল ও ময়দা চিনি গ্লুকোজ গুড় মিছরি মধু মদ ইত্যাদি যখন খাওয়া হয়, তখন হজম প্রক্রিয়াটি এমনভাবে ঘটে যে, গ্লুকোজ খুব দ্রুত রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হঠাৎ অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যায়। এই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসার জন্যে অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণের প্রয়োজন পড়ে। ফলে বাড়তি চাপ পড়ে অগ্ন্যাশয়ের ওপর।

এদিকে, ইনসুলিন এসে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা তো স্বাভাবিক করলো, কিন্তু এই অতিরিক্ত ইনসুলিন আবার লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ নামক একটি এনজাইমের নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়, যা রক্তের ফ্যাটগুলোকে ধরে ধরে কোষের ভেতর প্রবেশ করায়। ফলে শরীরে জমতে থাকে অতিরিক্ত ফ্যাট এবং ওজন বাড়তে থাকে। শুধু তা-ই নয়, এই অতিরিক্ত ইনসুলিন লিভার থেকে এইচএমজি কো-এ রিডাকটেজ নামক আরেকটি এনজাইমের

উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে লিভার বেশি বেশি কোলেস্টেরল তৈরি করতে থাকে।

অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার মূলত এই প্রক্রিয়াতেই রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। তাই আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা থেকে চিনি এবং মিষ্টি জাতীয় খাবারের পরিমাণ যতটা সম্ভব কমিয়ে দিন। সাম্প্রতিককালে চিনিকে অভিহিত করা হচ্ছে 'হোয়াইট পয়জন' নামে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব অঞ্চলের খাবারে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে বার্ধক্যজনিত রোগের প্রকোপও সেখানে তুলনামূলক বেশি এবং সেখানকার মানুষ দ্রুত বুড়িয়ে যায়।

অন্যদিকে, Complex carbohydrate খেলে আমাদের হজম প্রক্রিয়াটি এমনভাবে ঘটে যে, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে বেশ ধীর গতিতে। ফলে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা সবসময় মোটামুটি একইরকম থাকে, হঠাৎ করেই অনেক বেড়ে যায় না, ফলে অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণেরও প্রয়োজন পড়ে না এবং অগ্ন্যাশয়ের ওপরেও কোনো বাড়তি চাপ পড়ে না। তাতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও কমে। এসব খাবারকে তাই বলা হয় লো-গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খাবার। বিশ্বজুড়ে দিন দিন এসব খাবারের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

Complex carbohydrate-এ আরেকটি জিনিস থাকে যা স্বাভাবিক রেচনক্রিয়ার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো ফাইবার বা আঁশ।

আঁশ পরিপাকতন্ত্রে প্রচুর পানি ধরে রাখে বলে এটি পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা এবং কোষ্ঠ পরিষ্কারে সহায়তা করে। এছাড়াও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধে আঁশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই আঁশ আবার দুধরনের :

- অদ্রবণীয় আঁশ (Insoluble fibre) : এটি সাধারণত আবরণসহ গম, ভুট্টা ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।
- দ্রবণীয় আঁশ (Soluble fibre) : এটি সাধারণত ঢেঁকিছাটা চাল, যব এবং বিভিন্ন ধরনের ফল ও সব্জি, যেমন : গাজর শিম মটরশুঁটি ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এটি রক্তের গ্লুকোজ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য সম্পর্কে একটি তথ্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সেটি হলো, পুষ্টিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, একই পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট যদি দিনে তিনবারের বদলে অল্প অল্প করে পাঁচ/ ছয় বারে খাওয়া হয়, তবে কোলেস্টেরলের মাত্রা এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

☐ ফ্যাট বা স্নেহ

ফ্যাট মূলত দুধরনের :

- ◆ স্যাচুরেটেড ফ্যাট (Saturated fat)
- ◆ আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (Unsaturated fat)। এটিও দুধরনের :
  - ● পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (Polyunsaturated fat)
  - ● মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (Monounsaturated fat)

স্যাচুরেটেড ফ্যাট বা সম্পৃক্ত চর্বি রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা বাড়ায়। অন্যদিকে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বা অসম্পৃক্ত চর্বি (পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ও মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট) রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা কমায়। অর্থাৎ স্যাচুরেটেড ফ্যাট আমাদের শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। কারণ স্যাচুরেটেড ফ্যাট শরীরে প্রবেশের পর লিভার কর্তৃক কোলেস্টেরলে রূপান্তরিত হয়।

স্যাচুরেটেড ফ্যাট আছে যেসব খাবারে

- ☐ গরু মহিষ খাসি ও পাঁঠার মাংস
- ☐ মুরগি ও হাঁসের মাংস
- ☐ মুরগি ও হাঁসের চামড়া, হাড়ের মজ্জা
- ☐ চিংড়ি, মাছের ডিম, মাছের মাথা
- ☐ ডিমের কুসুম, কলিজা, মগজ
- ☐ মাখন ঘি ডালডা মার্জারিন
- ☐ নারিকেল, দুধের সর ইত্যাদি

আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট আছে যেসব খাবারে

- ☐ পূর্ণ শস্যদানা (আবরণসহ চাল গম ভুট্টা)
- ☐ সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ
- ☐ শিম, মটরশুঁটি
- ☐ সব ধরনের বাদাম
- ☐ সয়াদুধ ও সয়াপ্রোটিন ড্রিংকস
- ☐ স্পিরুলিনা বা সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি

তেল ॥ সত্যটা জানা জরুরি

'হৃদবান্ধব তেল' নিয়ে বাজারে ব্যবসা চলছে ধুন্ধুমার। বলা হচ্ছে, অমুক তেলে কোলেস্টেরল নেই, অমুক তেল শতভাগ কোলেস্টেরলমুক্ত ইত্যাদি। হ্যাঁ, কোলেস্টেরল নেই–এটি সত্য বটে, কিন্তু আংশিক সত্য। আসুন জেনে নিই, ফাঁকিটা কোথায়? বিভ্রান্তি এড়াতে সবসময় পুরো সত্যটা জানা জরুরি।

তেল হচ্ছে ১০০% ফ্যাট। সব ধরনের তেলে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত চর্বি দুটোই থাকে। আর আমরা আগেই জেনেছি, সম্পৃক্ত চর্বি বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট শরীরে প্রবেশের পর কোলেস্টেরলে রূপান্তরিত হয়।

বিভিন্ন ধরনের তেল (এক টেবিল চামচ) এবং অন্যান্য সমপরিমাণ চর্বিযুক্ত খাবারে থাকা ফ্যাটের তুলনামূলক চিত্র :

তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার	স্যাচুরেটেড ফ্যাট	মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট	পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট
সয়াবিন অয়েল	২.০ গ্রাম	৩.১ গ্রাম	৭.৮ গ্রাম
অলিভ অয়েল	১.৯ গ্রাম	৯.৮ গ্রাম	১.২ গ্রাম
সানফ্লাওয়ার অয়েল	১.৪ গ্রাম	২.৮ গ্রাম	৮.৭ গ্রাম
স্যাফ্লাওয়ার অয়েল	১.৩ গ্রাম	১.৭ গ্রাম	১০.০ গ্রাম
মুরগির চর্বি	৪.২ গ্রাম	৬.৪ গ্রাম	৩.০ গ্রাম
গরুর চর্বি	৭.১ গ্রাম	৬.০ গ্রাম	০.৫ গ্রাম

তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, সয়াবিন, সানফ্লাওয়ার ও স্যাফ্লাওয়ার তেলে অন্য তেলগুলোর তুলনায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট-এর পরিমাণ তুলনামূলক কম। তাই এগুলো অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর। কিন্তু সব ধরনের তেলেই যেহেতু ক্ষতিকর স্যাচুরেটেড ফ্যাট রয়েছে তাই সব ধরনের তেলই আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে, যদি পরিমাণটা অতিরিক্ত হয়। এছাড়াও তেলের পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটে থাকে ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড, যা শরীরের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

তাই আপনার দৈনন্দিন খাবারে তেলের পরিমাণ যত কম থাকে তত ভালো। আর আপনার করোনারি ধমনীতে যদি ব্লকেজ থাকে, তবে আপনার জন্যে সবচেয়ে ভালো হলো বিনা তেলে রান্না করা খাবার। প্রথম দিনেই বিনা তেলে রান্না খাবার খেতে যাবেন না, কারণ সেটি আপনার বিস্বাদ লাগবে। আপনার খাবারে তেলের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে আনুন। তাতে আপনি একসময় তেল ছাড়া রান্না খাবারেই চমৎকার অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন।

কোলেস্টেরল ॥ স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই

কোলেস্টেরল কি শুধুই ক্ষতিকর? শরীরে কি এর কোনোই প্রয়োজন নেই? আসলে কোলেস্টেরল শরীরের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। শরীরের প্রতিটি কোষের বহিরাবরণ বা সেল মেমব্রেন এবং কিছু হরমোন ও ভিটামিন তৈরির জন্যেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রশ্ন হলো, প্রতিদিন কতটুকু কোলেস্টেরল খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা উচিত?

গবেষণায় দেখা গেছে, যদি দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এক গ্রাম কোলেস্টেরলও না থাকে, তবুও শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় কোলেস্টেরলের তিন-চতুর্থাংশ শরীর নিজেই তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু খাবার থেকে যদি অতিরিক্ত কোলেস্টেরল শরীরে চলে আসে, তখনই এটি হয়ে ওঠে করোনারি হৃদরোগের কারণ। তাই সুস্থতার জন্যে প্রত্যেকেরই উচিত স্বল্প কোলেস্টেরলযুক্ত খাবারে অভ্যস্ত হওয়া।

কতটুকু কোলেস্টেরল হার্ট অ্যাটাকের জন্যে দায়ী? গবেষকদের মতে, করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন যারা, তাদের জন্যে একবেলার উচ্চ কোলেস্টেরল ও চর্বিযুক্ত খাবারও হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে। কারণ, অতিরিক্ত কোলেস্টেরল রক্তে প্রবেশের সাথে সাথে ফ্যাক্টর সেভেন ও থ্রম্বোক্সেন নিঃসৃত হয়, যা করোনারি ধমনীকে সংকুচিত করে ফেলে এবং ধমনীর ভেতরে দ্রুত রক্ত জমাটবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, যার ফলাফল হার্ট অ্যাটাক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোলেস্টেরল একদিকে যেমন শরীরের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আবার অতিরিক্ত হলে তা বেশ ক্ষতিকর।

কোলেস্টেরল মূলত দুই প্রকার :

- **উপকারী কোলেস্টেরল** : এইচডিএল
- **ক্ষতিকর কোলেস্টেরল** : এলডিএল

এইচডিএল-কে (HDL) আমরা অভিহিত করতে পারি নিঃস্বার্থ পরিচ্ছন্নকারী হিসেবে। এটি শরীরের জন্যে হিতকরী। এইচডিএল করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। এইচডিএল শরীরের জন্যে ক্ষতিকারক এলডিএল কোলেস্টেরলকে বিভিন্ন কোষ থেকে বের করে লিভারে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে পিত্তের মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্র দিয়ে বের করে দেয়। তাই রক্তে এর পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকা উচিত।

এইচডিএল-এর পরিমাণ পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪০ মিগ্রা/ ডেসিলিটার-এর বেশি, মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫০ মিগ্রা/ ডেসিলিটার-এর বেশি, আর যারা

ইতোমধ্যেই করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন তাদের রক্তে এর পরিমাণ থাকা প্রয়োজন ৬০ মিগ্রা/ ডেসিলিটার-এর বেশি।

অন্যদিকে, অতিরিক্ত এলডিএল (LDL) কোলেস্টেরল শরীরের জন্যে ক্ষতির কারণ। এর পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে পড়লে এটি করোনারি ধমনীতে ব্লকেজ তৈরি করে। আর আমাদের রক্তে এলডিএল-এর পরিমাণ কতটুকু পর্যন্ত নিরাপদ সেটি আমাদের জানা প্রয়োজন।

□ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ–এর কোনোটিই নেই, এমন একজন সুস্থ মানুষের রক্তে এলডিএল-এর পরিমাণ ১৫০ মিগ্রা/ ডেসিলিটার-এর কম থাকতে হবে।

□ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন অর্থাৎ করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি আছে এমন কারো রক্তে এলডিএল-এর পরিমাণ থাকতে হবে ১০০ মিগ্রা/ ডেসিলিটার-এর কম।

□ করোনারি হৃদরোগীদের রক্তে এলডিএল-এর পরিমাণ থাকতে হবে অবশ্যই ৭০ মিগ্রা/ ডেসিলিটার-এর কম।

আমাদের দৈনন্দিন কিছু খাবারে কোলেস্টেরলের পরিমাণ নিম্নরূপ :

বিভিন্ন ধরনের খাবার	পরিমাণ	এলডিএল কোলেস্টেরল (মিগ্রা)
গরুর মগজ	১০০ গ্রাম	২১০০
গরুর কলিজা	১০০ গ্রাম	৩০০
গরুর মাংস	১০০ গ্রাম	১০০
মুরগির ডিম	১টি (মাঝারি সাইজ)	২৫০
ডিমের কুসুম	১টি (মাঝারি সাইজ)	২৫০
তেলে ভাজা সম্পূর্ণ ডিম	১টি (মাঝারি সাইজ)	২৮০
মুরগির মাংস (চামড়াসহ)	১০০ গ্রাম	৭২
মুরগির কলিজা	১০০ গ্রাম	৮৮
ননীযুক্ত দুধ	১ কাপ	৩৪
সম্পূর্ণ সর তোলা দুধ	১ কাপ	২০
সম্পূর্ণ ননী ছাড়া দুধ	১ কাপ	৫
দই (পূর্ণ ননীযুক্ত)	১ কাপ	৩০
দই (অল্প ননীযুক্ত)	১ কাপ	১৪
বিফ বার্গার	১টি	২৬
গলদা ও বাগদা চিংড়ি	১০০ গ্রাম	১০০

ট্রাইগ্লিসারাইড

রক্তে চর্বি বা কোলেস্টেরলের পরিমাণ দেখতে চাইলে চিকিৎসকরা রক্তের লিপিড প্রোফাইল করার পরামর্শ দেন। তাতে এইচডিএল ও এলডিএল কোলেস্টেরলের পাশাপাশি আরো একপ্রকার ফ্যাটের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়ে থাকে, যার নাম ট্রাইগ্লিসারাইড (টিজি)।

ট্রাইগ্লিসারাইড এক ধরনের ফ্যাট। লিভারের মাধ্যমে শরীর নিজেও এটি তৈরি করে থাকে। স্বাভাবিক শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রম পরিচালনাসহ শরীরে শক্তি যোগাতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ট্রাইগ্লিসারাইডের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু এর পরিমাণ অতিরিক্ত হলে তা শরীরের জন্যে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাত্রাতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড করোনারি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তাই রক্তে এর পরিমাণ ১৫০ মিগ্রা/ডেসিলিটার-এর কম থাকা বাঞ্ছনীয়।

অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা (দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে ভাতের পরিমাণ বেশি থাকলে), অতিরিক্ত চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার, তেল-চর্বিজাত খাবার এবং এলকোহল শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। এছাড়াও ধূমপান, শারীরিক পরিশ্রমহীন অলস জীবনযাপন, মেদস্থূলতা ও অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের ফলে রক্তে এর পরিমাণ বেড়ে যায়।

সুস্থ হৃৎপিণ্ড ও সুস্থ জীবনের জন্যে কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করুন

সাধকদের হাজার বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আর আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের সমন্বিত প্রয়াসই কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস। সুস্থ জীবন-অভ্যাস অনুসরণের পাশাপাশি কোয়ান্টাম খাদ্যতালিকা অনুসরণ করুন। হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক এবং ডায়াবেটিসের মতো রোগগুলো আপনি সহজেই প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। জীবন ভরে উঠবে সুস্থতা আর প্রাণপ্রাচুর্যে।

পর্যাপ্ত খাওয়া যাবে

□ সব ধরনের ডাল : ছোলা মটর মসুরি মুগ অড়হর (কলাই ছাড়া, কারণ তাতে কোলেস্টেরল থাকে)

□ সব ধরনের শাক : পুঁই শাক, লাল শাক, মটর শাক, কলমি শাক, পাট শাক, কচু শাক, পালং শাক

□ সব ধরনের সব্জি : ঢেঁড়স বরবটি শিম কচু ফুলকপি বাঁধাকপি ঝিঙ্গে ধুন্দল পেঁপে পটল করলা টমেটো মুলা কুমড়া শালগম বেগুন লাউ সজনে ও ওল কচু, মান কচু

□ ফল : পেয়ারা জাম্বুরা আমলকি কুল বেল জাম জামরুল শরিফা কলা আমড়া কামরাঙা

□ সালাদ : শসা টমেটো লেটুস ধনেপাতা গাজর

পরিমাণ বুঝে খেতে হবে (হৃদরোগীরা মাছ ও মাংস না খেলে ভালো)

□ ভাত, রুটি (গম যব ভুট্টা), গোল আলু, মিষ্টি আলু

□ চামড়া ছাড়া ছোট মুরগির মাংস (এক কেজির চেয়ে ছোট)

□ মিঠা পানির ও সামুদ্রিক সব ধরনের ছোট ও বড় মাছ

□ মিষ্টি ফল : পাকা আম, জাম, কাঁঠাল, পাকা কলা, পাকা পেঁপে, আনারস, আপেল, কমলা, আঙ্গুর, তরমুজ, বাঙ্গি, খেজুর

□ ননী তোলা দুধ ও দুধের তৈরি খাবার (হৃদরোগীরা না খেলে ভালো)

□ ডিম (হৃদরোগীরা ডিমের শুধু সাদা অংশটুকু খেতে পারেন)

□ লবণ (রান্নায় অতিরিক্ত লবণ/ পাতে লবণ খাবেন না)

□ মধু (ডায়াবেটিস থাকলে খাবেন না)

হৃদরোগীদের জন্যে পুরোপুরি নিষেধ (যারা হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে চান তারাও এগুলো যত কম খান তত ভালো)

□ গরু, মহিষ, খাসি ও পাঁঠার মাংস, হাঁসের মাংস, ডিমের কুসুম, কলিজা, মগজ, মাছের ডিম, মাছের মাথা, হাড়ের মজ্জা, ঘি, মাখন, ডালডা, মার্জারিন, চিংড়ি, নারিকেল, দুধের সর

□ অতিরিক্ত ভাজা ও তৈলাক্ত খাবার

□ ফাস্টফুড : কেক পেস্ট্রি পুডিং বার্গার হটডগ স্যান্ডউইচ পিৎজা পেটিস আইসক্রিম কফি ও চিকেন ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ইত্যাদি

খেলে উপকার আছে

□ স্পিরুলিনা

□ টক দই (ইয়োগার্ট) : এক কাপ প্রতিদিন

□ বাদাম : ৫০ গ্রাম প্রতিদিন

□ সয়াদুধ/ সয়াপ্রোটিন ড্রিংকস : ২৫০ গ্রাম প্রতিদিন

□ রসুন : ১টি কোষ প্রতিদিন

□ লেবু : পরিমিত □ মাশরুম

সবার জন্যে পুরোপুরি নিষেধ

- ☐ সব ধরনের কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস ও প্রক্রিয়াজাত জুস
- ☐ সিগারেট চুরুট এলকোহল তামাক ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য

প্রতিদিন আপনার খাবারে থাকতে হবে

কার্বোহাইড্রেট	:	৭০–৭৫%
প্রোটিন	:	১৫–২০%
ফ্যাট	:	১০% (আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট হলেই ভালো)

কতটুকু খাবেন?

সবসময় পরিমিত খাবেন। এ ব্যাপারে নবীজীর (স) একটি হাদীস আমরা অনুসরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন, তুমি তোমার পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাবার ও এক-তৃতীয়াংশ পানীয় দ্বারা পূর্ণ কর। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ ফাঁকা রাখো। দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে, এভাবে খাবার গ্রহণ করলে শরীরের ওজন সবসময় নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং শরীর থাকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর।

কী পরিমাণ খাবেন?

সকালে তুলনামূলক বেশি নাশতা করুন, দুপুরে তৃপ্তির সাথে খান এবং রাতে একেবারেই হালকা খাবার গ্রহণ করুন।

সাপ্তাহিক খাদ্যতালিকা (হৃদরোগীরা মাছ ও মাংস না খেলে ভালো)

- ☐ সপ্তাহে ২ দিন : ভাত/ রুটি, ডাল, শাক, সব্জি, সালাদ, ফল, ছোট মাছ
- ☐ সপ্তাহে ২ দিন : ভাত/ রুটি, ডাল, শাক, সব্জি, সালাদ, ফল, বড় মাছ
- ☐ সপ্তাহে ১ দিন : ভাত/ রুটি, ডাল, শাক, সব্জি, সালাদ, ফল, মুরগি
- ☐ সপ্তাহে ২ দিন : ভাত/ রুটি, ডাল, শাক, সব্জি, সালাদ, ফল

প্রতিদিন দুই/ তিন ধরনের মৌসুমি ফল খান।

প্রতিদিন প্রচুর পানি পান করুন। দিনে কমপক্ষে তিন থেকে চার লিটার।

হৃদবান্ধব খাদ্যতালিকার কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জেনে নিন

বাদাম

বাদাম খুব সহজলভ্য একটি খাবার এবং এটি আপনার হৃদযন্ত্রের জন্যে বেশ উপকারী। একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, বাদাম হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। বাদামে ফ্যাট আছে, এই ভয়ে অনেকে বাদাম খেতে চান না; কিন্তু জানা জরুরি যে, এই ফ্যাটের প্রায় পুরোটাই অসম্পৃক্ত চর্বি, যা আপনার হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখে। পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে পাঁচবারের বেশি বাদাম খান যারা, করোনারি হৃদরোগে তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা ২৫ থেকে ৩৯ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়।

নিয়মিত বাদাম খেলে আপনার শরীরের জন্যে হিতকরী কোলেস্টেরল এইচডিএল-এর মাত্রা বাড়ে। সেইসাথে বাদাম একটি লো-গ্লাইসেমিক ইনডেক্স সমৃদ্ধ খাবার বলে এটি ডায়াবেটিস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে। সব ধরনের বাদামেই উপকারিতা কমবেশি সমান; তবে চিনাবাদাম সহজলভ্য বলে আপনি এটি প্রতিদিন খেতে পারেন। প্রতিদিন মুঠোভর্তি (৫০ গ্রাম) বাদাম খান। লবণযুক্ত প্রক্রিয়াজাত বাদাম না খেলেই ভালো।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড

স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের কাছে এ নামটি এখন আর অপরিচিত কিছু নয়। ওমেগা-৩ এক ধরনের পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড।

ওমেগা-৩ হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। এটি উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। কমিয়ে দেয় ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা। এটি তাই হৃৎপিণ্ডের জন্যে উপকারী।

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ দুটি উৎস থেকেই ওমেগা-৩ পাওয়া যায়। উদ্ভিদজাত যেসব খাবারে এটি পাওয়া যায় : পূর্ণ শস্যদানা, বাঁধাকপি ও ব্রকোলিসহ সবুজ শাক-সব্জি, শিম, মটরশুঁটি, মুগডাল, তাজা ফলমূল, রসুন, তিসির তেল, অলিভ অয়েল, চিনাবাদাম, আখরোট এবং স্পিরুলিনা।

আর মাছ, বিশেষত সামুদ্রিক মাছ, ডিম ও টক দই হলো সেসব প্রাণীজ উৎসজাত খাবার, যা থেকে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ ওমেগা-৩ অনায়াসে পেতে পারি। তবে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এটি আপনার হার্টের জন্যে উপকারী হলেও, অতিরিক্ত ওমেগা-৩ আপনার স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তাই এটি গ্রহণ করতে হবে পরিমিত এবং সেটি যেন হয় প্রাকৃতিক বা উদ্ভিদজাত উৎস থেকেই, আর দৈনন্দিন কোয়ান্টাম খাদ্যতালিকাই এর জন্যে যথেষ্ট।

ওমেগা-৩ ক্যাপসুল বা প্রক্রিয়াজাত ফিস অয়েল ক্যাপসুল নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে চলছে ব্যাপক হইচই। কিন্তু জেনে রাখুন, ওমেগা-৩ ক্যাপসুল হিসেবে আপনি যা সেবন করছেন, সেটি আপনার কোনোরকম উপকার করছে না। এটি এখন পরীক্ষিত সত্য।

সম্প্রতি (১২ সেপ্টেবর, ২০১২) জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন (JAMA) একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, ২০টিরও বেশি গবেষণা-কার্যক্রমের অধীনে ৭০,০০০ মানুষের ওপর নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, হৃদরোগীদের ওপর ওমেগা-৩ ক্যাপসুলের কোনোরকম উপকারী ভূমিকার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা এখন তাই ওমেগা-৩'র জন্যে ক্যাপসুলের বদলে প্রাকৃতিক ও উদ্ভিদজাত খাবারকেই বেছে নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

স্পিরুলিনা

স্পিরুলিনা হলো অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক নীলাভ সবুজ সামুদ্রিক শৈবাল, যা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। জাতিসংঘ স্পিরুলিনাকে একবিংশ শতাব্দীর খাদ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে।

স্পিরুলিনাতে দুধের চেয়ে ২০ গুণ, ডিমের চেয়ে ছয় গুণ এবং মাছ ও মাংসের চেয়ে অন্তত তিন গুণ বেশি প্রোটিন রয়েছে, যা সম্পূর্ণ কোলেস্টেরলমুক্ত। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন, মিনারেল, আয়রন, ফলিক এসিড ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। খাওয়ার সুবিধার্থে ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, পাউডার বিভিন্ন ধরনে এটি পাওয়া যায়।

স্পিরুলিনার উপকারিতা :

- এলডিএল কোলেস্টেরল কমায়
- ওজন কমায়
- দেহের ক্ষতিকর টক্সিন দূর করে
- লিভারকে শক্তিশালী করে
- রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণ করে
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়
- অকাল বার্ধক্য রোধ করে

রসুন

রক্তে এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে রসুন উপকারী। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ও চীনে এটি ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা রসুনকে অভিহিত করেছেন প্রাকৃতিক এন্টিবায়োটিক হিসেবে।

এছাড়াও রসুন উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে গ্লুকোজের মান নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। সেইসাথে এটি ঠান্ডাজনিত যেকোনো সমস্যা এবং ফ্লু প্রতিরোধ করে। হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা ও সার্বিক সুস্বাস্থ্যের জন্যে প্রতিদিন রসুনের একটি কোষ খান।

টক দই (ইয়োগার্ট)

চিনি ছাড়া দই অর্থাৎ টক দই হৃৎপিণ্ডের পাশাপাশি পুরো শরীরের জন্যেই অত্যন্ত উপকারী। করোনারি হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন যারা, তাদের জন্যে টক দই বিশেষভাবে উপকারী।

টক দই আপনার পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সেইসাথে এটি ত্বকের জন্যেও উপকারী। তাই প্রতিদিন এক কাপ টক দই খান।

সয়াদুধ/ সয়াপ্রোটিন ড্রিংকস

সয়াদুধ বা সয়াপ্রোটিন প্রথম শ্রেণীর উদ্ভিদজাত প্রোটিন। এটি গরুর দুধের বিকল্প এবং শতভাগ কোলেস্টেরল মুক্ত। হৃদরোগীরা গরুর দুধের বিকল্প হিসেবে সয়াদুধ/ সয়াপ্রোটিন ড্রিংকস প্রতিদিন ২৫০ মিলি খেতে পারেন। বাজার থেকে সয়াবিন কিনে নিয়ে আপনি নিজেই বাড়িতে বসে সয়াদুধ তৈরি করে নিতে পারেন।

সয়াদুধ তৈরির নিয়ম :

২৫০ গ্রাম সয়াবিন ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর সেই পানি ফেলে দিয়ে তাতে এক লিটার পানি মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। অথবা পাটায় পিষে নিতে পারেন। দুধ তৈরি হলে পাতলা কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে নিন। এরপর জ্বাল দিয়ে নিন। সয়াদুধ গরম কিংবা ঠান্ডা যেকোনোভাবে খেতে পারেন। সয়াদুধের নিজস্ব কোনো ফ্লেভার নেই। তাই পছন্দমতো যেকোনো ফল কিংবা বাদাম মিশিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন মজাদার পানীয়।

১০

ধূমপান ॥
নীরবে বাড়িয়ে চলে হৃদরোগের ঝুঁকি

ধূমপান করোনারি ধমনীর সংকোচন ঘটায়

বলা হয়ে থাকে, একটি সিগারেটের একপ্রান্তে থাকে আগুন আর অন্যপ্রান্তে থাকে একজন আহাম্মক। যদিও ধূমপান নিয়ে এটি নিছকই একটি কৌতুক, কিন্তু জেনে রাখুন, ধূমপান নীরবে বাড়িয়ে চলেছে আপনার করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি। বিষয়টি যখন আপনার কাছে আরো দৃশ্যমান আর স্পষ্ট হয়ে উঠবে, ততদিনে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে। সচেতন হওয়ার সময় আপনি আর না-ও পেতে পারেন।

ধূমপানকে একসময় স্ট্যাটাস সিম্বল মনে করা হলেও, গত শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এবং বাংলাদেশে প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে ধূমপান বিরোধী আন্দোলন 'আধূনিক' শুরু হওয়ার পর থেকে একজন ধূমপায়ীকে মনে করা হয় সমাজের সবচেয়ে অসচেতন ব্যক্তি। স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে তো নয়ই, বরং ধূমপানকে এখন একটি গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সিগারেটে 'সুখটান' দেয়া ধূমপায়ীরা কি জানেন, তারা কী পান করছেন? ধূমপানের সঙ্গে তারা প্রায় চার হাজার ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিজের ভেতরে টেনে নিচ্ছেন, যার সবই শরীরের জন্যে বিষ। এগুলোর একটি হলো নিকোটিন। সবচেয়ে ভয়ের কথাটি হলো, এই নিকোটিন হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীর দেয়ালে অযাচিত সংকোচন ঘটায় (Coronary artery spasm), ফলে ধমনী-পথে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, অন্য যে-কারো চেয়ে একজন ধূমপায়ীর হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা ছয় গুণেরও বেশি।

জানা প্রয়োজন, ইতোমধ্যে করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন যারা, তাদের জন্যে অনেক সময় একটি সিগারেটও হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনায় আপনি এমনিতেই ভেঙে পড়েছেন, মুষড়ে পড়েছেন, ভুগছেন মারাত্মক দুশ্চিন্তা আর স্ট্রেসে। আমরা আগেই জেনেছি, স্ট্রেস হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীকে সংকুচিত করে। উপরন্তু আপনি টেনশন মুক্তির তথাকথিত উপায় হিসেবে সিগারেট ফুঁকছেন আর পায়চারি করছেন। এদিকে দুয়ে মিলে ধমনীর সংকোচন হঠাৎ আরো বেড়ে যেতে পারে এবং যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে হার্ট অ্যাটাকের মতো দুর্ঘটনা।

ধূমপান করোনারি ধমনীর অযাচিত সংকোচন ঘটায় (Coronary artery spasm)

শুধু তা-ই নয়, ধূমপান নানাভাবে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। যেমন, ধূমপানের ফলে শরীরের জন্যে উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএল-এর পরিমাণ কমে যায় এবং বাড়ে ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ।

এছাড়াও, ধূমপান যে ক্যান্সারের কারণ, এটি এখন আর কারো অজানা নয়। সেইসাথে অন্যান্য রোগঝুঁকি তো আছেই। গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণভাবে ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীদের চেয়ে ২২ বছর আগে মারা যেতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীতে প্রতিবছর প্রায় ৫০ লক্ষ প্রাণহানি ঘটে কেবল ধূমপানজনিত রোগের কারণেই।

একজন ধূমপায়ী শুধু যে নিজের ক্ষতিই করেন, তা নয়; চরম অসচেতনতার পরিচয় দিয়ে তিনি নির্বিকারে তার চারপাশের মানুষ ও পরিবেশের ক্ষতিও করে যাচ্ছেন। বলা হয়, প্রত্যক্ষ ধূমপানের চেয়ে পরোক্ষ

ধূমপান (Passive smoking) কোনো অংশে কম ক্ষতিকর নয়। অর্থাৎ একজন ধূমপায়ীর সিগারেটের ধোঁয়া থেকে তার স্বামী/ স্ত্রী সন্তানসহ পরিবারের সদস্য এবং সহকর্মী প্রিয়জন কেউই ঝুঁকিমুক্ত নন।

তাই হৃদযন্ত্রের সুস্থতা তো বটেই, সেইসাথে নিজের ও প্রিয়জনদের সার্বিক সুস্থতা এবং সুস্বাস্থ্যের জন্যেই আমাদের প্রয়োজন ধূমপানমুক্ত সুস্থ সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা।

ধূমপানের বদভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারেন আপনিও

করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকিগুলো সম্বন্ধে আমরা আগেই জেনেছি, যার একটি হলো ধূমপান। আমরা বলতে পারি, এটি এমন একটি ঝুঁকি, যা থেকে আপনি চাইলে বেরিয়ে আসতে পারেন। আর হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্যে ধূমপান বর্জনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধূমপান বর্জনের জন্যে আপনি একটি কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। গত দুই দশকে অসংখ্য মানুষ এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করে এ বদভ্যাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়েছেন।

১. ধূমপান ছাড়ার জন্যে বাস্তবে কোনো দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন নেই। এজন্যে নিজের ইচ্ছা আর সিদ্ধান্তটাই যথেষ্ট।

২. অনেকেই সিগারেট ছাড়ার কথা ভেবে পকেটে সিগারেট রাখেন না। ভাবেন, পকেটে থাকলেই খেতে ইচ্ছে করবে। তারা বুঝতে পারেন না যে, সাথে না থাকলে ধূমপানের ইচ্ছেটা আরো বেশি হবে। পকেটে সিগারেট না রাখলে দেখা যাবে, আপনি অন্যের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিচ্ছেন। তাই সিগারেট ও ম্যাচ পকেটেই রাখুন।

৩. আপনি শুধু খেয়াল রাখুন, কখন আপনি সিগারেট ধরান। ধূমপানের ইচ্ছা একেকজনের মধ্যে একেক সময়ে জাগে। কেউ টেলিফোনে আলাপ করতে করতে, কেউ কোনো আলোচনার শুরুতে, কেউ টিভি দেখার সময়, কেউ খাবারের পর পর, কেউ-বা আবার চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সিগারেট ধরান। এ সময়গুলোতে তিনি অনেকটা নিজের অজান্তেই সিগারেট ধরিয়ে ফেলেন।

আজ থেকে আপনি শুধুমাত্র অন্য কাজ করার সময় ধূমপান করা থেকে বিরত থাকুন। যদি সিগারেট ধরিয়ে ফেলার পর খেয়াল হয় যে, আপনি সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছেন তাহলে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি এখন সত্যি সত্যি সিগারেট খেতে চান কি না।

৪. যদি সত্যি সত্যিই সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহলে অন্য সব কাজ বাদ দিয়ে চুপচাপ আরাম করে বসুন। চুপচাপ বসে সিগারেট খান। মনোযোগ দিয়ে সিগারেট খান।

৫. সিগারেট খাওয়ার সময় শরীরের প্রতি মনোযোগ দিন। চোখ বন্ধ করে সিগারেটে টান দিয়ে অবলোকন করুন, সিগারেটের ধোঁয়া নাক দিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে তা একটা গোখরা সাপের আকার ধারণ করছে। ফুসফুসে গিয়েই ফণা তুলে ছোবল মারছে আর ঢেলে দিচ্ছে নিকোটিন নামের বিষ। একটা বিষাক্ত সাপ ছোবল মারলে আপনার দেহ-মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি হতো ক্ষণিকের জন্যে সে অনুভূতি সৃষ্টি করুন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অনুভূতি না এলে সে অনুভূতির অভিনয় করুন। (মনে করুন, মঞ্চে নাটক করছেন। নাটকে আপনাকে অভিনয় করতে হচ্ছে সাপে আক্রান্ত পথিকের ভূমিকায়। সত্যি সত্যি সাপ ছোবল মারলে আপনার যে মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া হতো, তা-ই করুন।) মনের চোখে আপনার নাক মুখ গলা হৃৎপিণ্ড পাকস্থলীর প্রতিক্রিয়া অবলোকন করুন।

৬. পুনরায় সিগারেটে টান দিন। অবলোকন করুন, আরেকটা গোখরা সাপ ফুসফুসের দিকে যাচ্ছে। পূর্বের প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করুন।

৭. এ পদ্ধতিতে পুরো সিগারেট শেষ করুন। এই পুরো প্রক্রিয়ায় আপনার যে অনুভূতি হলো তা একটি কাগজ বা ডায়রিতে লিখে রাখুন।

৮. শুধু মনে রাখুন, অন্যের সামনে বা অন্য কোনো কাজ করতে করতে সিগারেট খাবেন না। যখন সিগারেট খেতে ইচ্ছে করবে অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে নিরিবিলি বসে এ প্রক্রিয়ায় সিগারেট খাবেন।

এ প্রক্রিয়া কয়েকদিন চালিয়ে গেলে অচিরেই দেখবেন, আপনার দেহ-মন নিজ থেকেই সিগারেট প্রত্যাখ্যান করছে। সিগারেটে টান দিতেই কাশি চলে আসছে। বিস্বাদ লাগছে। সিগারেটের ধোঁয়া গন্ধ লাগতে শুরু করেছে। এভাবে খুব সহজেই ধূমপানের বদভ্যাস থেকে আপনি পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবেন।

ধূমপান বর্জনের ক্ষেত্রে মেডিটেশনের শক্তিকে আপনি চমৎকারভাবে কাজে লাগাতে পারেন।

মেডিটেশন ॥ ধূমপান বর্জন

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির দরবার কক্ষে গিয়ে বসুন।

২. ৩-২-১-০ গণনা করে হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করুন। আরাম করে বসুন আপনার হিলিং চেয়ারে।

৩. এবার আপনার ধূমপান সংক্রান্ত চিত্র পর্যালোচনা করুন। একে একে দেখুন, ধূমপানের ফলে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দিক থেকে আপনি কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দৈহিক ও মানসিক ক্ষতিপূরণের জন্যে যা করতে হবে, তা নিজেকে বলুন। ধূমপান কীভাবে আপনার হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি করছে, করোনারি ধমনীকে সংকুচিত করে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত করছে তা অবলোকন করুন। ধূমপানের অন্যান্য শারীরিক ক্ষতিগুলোও দেখতে চেষ্টা করুন। পুরো বিষয়টি বার বার ভিজুয়ালাইজ করুন।

(ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো মনকে পুরোপুরি বোঝাতে যে ধরনের কল্পনা বা ছবি ব্যবহার করা প্রয়োজন মনে করেন, সেভাবে নিজের ইচ্ছেমতো ছবি বা প্রতীক ব্যবহার করুন)

তারপর দেখুন, এসব জীবননাশী ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে আপনি ধূমপান ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। ছেড়ে দেয়ার ফলে আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় নি। বরং আপনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। নিকোটিনের প্রভাব কেটে যাওয়ায় আপনার প্রাণপ্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে, চেহারায় এসেছে একটা আলাদা ঔজ্জ্বল্য। সিগারেটের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করায় আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। বাস্তবে এ ঘটনা ঘটলে যে আনন্দ-অনুভূতি হতো, সবগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে আপনি তা অনুভব করুন। পূর্ণ আবেগ দিয়ে আপনার ধূমপান মুক্ত সত্তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন।

৪. নিয়মমাফিক হিলিং সেন্টার ও মনের বাড়ি থেকে স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

একনাগাড়ে ৪০ দিন এ অনুশীলন করে যান। এ পর্যন্ত যারাই এটি অনুশীলন করেছেন–দেখা গেছে, ধূমপানের প্রতি তাদের আগ্রহ কয়েকদিনের মধ্যেই কমতে শুরু করেছে।

এছাড়াও ধোঁয়া জাতীয় ড্রাগে কারো আসক্তি থাকলে তারাও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারেন। কখনো কারো সামনে ড্রাগ নেবেন না।

নেয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগলে একা নিরিবিলি বসে উপরিউক্ত নিয়মে নেশাদ্রব্যে টান দিন। একই ছবি অবলোকন করুন। আপনার শরীরই একসময় ড্রাগ প্রত্যাখ্যান করবে।

এলকোহল বর্জন

এলকোহল বা যেকোনো ধরনের তরল কিংবা ট্যাবলেট জাতীয় মাদক বর্জনের ক্ষেত্রেও এই একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করুন। কোনো কাজ করতে করতে, কথা বলতে বলতে বা অন্যের সামনে বা কারো সাথে একত্রিত হয়ে মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকুন।

যখনই এলকোহল পানের প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগে একই নিয়মে একা নিরিবিলি বসুন। গ্লাসে করে এক চুমুক পান করুন। শুধু চিত্রকল্পটি পাল্টে দিন। নিজের দেহকোষগুলোকে ছোট ছোট শিশু হিসেবে অবলোকন করুন এবং দেখুন, মাদকদ্রব্য এসিডের মতো গিয়ে এই সুন্দর সুন্দর শিশুর মুখ ও শরীরকে গলিয়ে বিকৃত কদাকার করে দিচ্ছে...। যত স্পষ্টভাবে সম্ভব কল্পনা করুন, মাদকদ্রব্য গিয়ে স্পর্শ করার সাথে সাথে এই ছোট ছোট সুন্দর নিষ্পাপ শিশুদের চেহারা ও সমস্ত শরীর এসিডে গলে বীভৎস হয়ে যাচ্ছে...। যতবার গ্লাসে চুমুক দেবেন ততবারই এই দৃশ্য দেখতে থাকুন।

আপনার অনুভূতি সামনে রাখা কাগজ বা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করুন। প্রতিবার এলকোহল গ্রহণের সময় এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করুন। অচিরেই আপনার দেহ এলকোহল বা এই ধরনের মাদক প্রত্যাখ্যান করবে।

১১

গ্রুপ সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং ॥ আপনি একা নন

আমাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি সংবেদনশীল মন। আছে সুখ দুঃখ কষ্ট আনন্দ বেদনার মতো বিচিত্র আবেগ। এই আবেগ-অনুভূতি আমরা যে কেবল নিজের মধ্যে চেপে রাখি, তা নয়। ভাই বন্ধু সহপাঠী প্রিয়জনকে বলি। ভাব-বিনিময় করি। এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু সবাই কি সবসময় এটা পারেন? যিনি পারেন না, তিনি দিনের পর দিন বয়ে বেড়ান সে কষ্ট। গবেষণায় দেখা গেছে, মনের কোণে জমে থাকা দীর্ঘদিনের কষ্ট, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর আবেগের আগ্রাসন থেকে সৃষ্টি হতে পারে হরেক রকম জটিল রোগব্যাধি, এমনকি তা রূপ নিতে পারে ক্যান্সারে। কারণ, ধ্বংসাত্মক আবেগ মানুষের শরীর-মনকে বেশ ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করে। আর ক্রমাগত এ অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একসময় সে হয়ে পড়ে ক্লান্ত ও উদ্যমহীন। অসুস্থ হতে শুরু করে নানাভাবে। এর সবচেয়ে বড় শিকার হয় আমাদের নিঃস্বার্থ ও পরম বন্ধু হৃৎপিণ্ড।

চাই পারিবারিক সম্প্রীতি

আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, প্রাচ্যে এখনো পরিবার-প্রথা টিকে আছে। আমাদের যেকোনো সমস্যায় প্রথমেই সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে কাছে এসে দাঁড়ায় পরিবারের সদস্যরা। এর পাশাপাশি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে আছে আমাদের একটি বৃহত্তর পরিবার। সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান সবমিলিয়ে আমাদের জীবনযাপন তুলনামূলক একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ। আর পারিবারিক ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে (ফেসবুক-ইন্টারনেটের সামাজিক যোগাযোগ নয়) যে মানুষ যত সঙ্ঘবদ্ধ, তার দুঃখ কষ্ট হতাশার পরিমাণ তত কম। তিনি চাপ বোধ করেন কম। তাই পারিবারিক সম্প্রীতি ও একাত্মতা গড়ে তুলুন। পরিবারের সদস্যরাই যেন হয়ে ওঠে আপনার সকল অনুপ্রেরণা ও আনন্দের উৎস।

একটি আনন্দময় পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে মনোযোগী হোন। টেনশন-উদ্রেককারী টিভি সিরিয়াল, টক শো, কম্পিউটার-ইন্টারনেটের সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়ার চেয়ে পরিবারকে সময় দেয়া ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, দীর্ঘক্ষণ টেলিভিশনের সামনে বসে থাকেন কিংবা রাত জেগে টিভি দেখেন যারা, তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক বেশি। তাই বাসায় যতক্ষণই থাকুন, পুরোটা সময় মনোযোগ দিন আপনার পরিবারের সদস্যদের প্রতি। আপনি নিজেও সবদিক থেকে ভালো থাকবেন। আপনার সার্বিক সুস্থতার জন্যেই একটি শান্তিপূর্ণ ও সুখী পারিবারিক পরিবেশ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

সঙ্ঘবদ্ধ পথ চলা ॥ সুস্বাস্থ্যের জন্যেই প্রয়োজন

একসাথে মিলেমিশে কাজ করেন এবং যূথবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেন যারা, পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে তারা হয়ে ওঠেন একে অন্যের শক্তি। প্রত্যেকেই হয়ে ওঠেন প্রত্যেকের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগী ও আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী। জীবনযাপনের বেলায়ও এ কথা সত্যি। সঙ্ঘবদ্ধ অনুসরণের ফলে সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস আয়ত্ত করা যায় অনেক সহজে।

ডা. ডিন অরনিশ পরিচালিত হৃদরোগ নিরাময় কার্যক্রমে হৃদরোগীরা প্রতি সপ্তাহে গ্রুপ সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং সেশনে মিলিত হতেন। সেখানে তারা অনুভূতি-অভিজ্ঞতা বিনিময় করতেন। দেখা যেত, একজন হয়তো এমন একটি সমস্যায় ভুগছিলেন, যা তিনি কাউকে বলতে পারছিলেন না, কাউন্সেলিং সেশনে তিনি তার সতীর্থ ও কাউন্সিলরদের সাথে বিষয়টি নিয়ে নিঃসঙ্কোচে আলাপ করতেন। সবাই সেখানে একে অন্যের আবেগ-অনুভূতি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দেয়ার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই কাউন্সেলিং সেশনটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। সবাই মিলে এমনই উপভোগ করতে শুরু করলেন যে, জড়তার দেয়াল ভেঙে তারা একে অন্যের সাথে মিশে গেলেন। ফলে জীবনের অনেক চাপা কষ্টের কথা তারা সেখানে বলতে পারছিলেন এবং কখনো কখনো কেঁদেকেটে বুকটাকে হালকা করে তারা বাড়ি ফিরতেন। শুধু তা-ই নয়, তাদের মধ্যে যারা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও নতুন জীবনধারার সাথে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না, তারাও একসময় সুস্থ জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন বেশ চমৎকারভাবে। সবকিছুই শুরু করলেন নতুনভাবে।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব ॥ একা নয়, একসাথে

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব এমন একটি প্লাটফরম–যেখানে একা নয়, রয়েছে সুস্থতার পথে একসাথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ। এখানে সাপ্তাহিক কাউন্সেলিং সেশনে এসে হৃদরোগীরা খোলামেলা আলোচনায় তাদের সমস্যা তুলে ধরেন এবং নিজেদের সমস্যামুক্তি ও সম্ভাবনার পথ খুঁজে পান।

এ কার্যক্রমের মূল প্রাণ এ ক্লাবের সদস্যরা। এতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সুস্থ জীবন-অভ্যাস চর্চা করা তাদের জন্যে হয়ে ওঠে অনেক সহজ। একজন হয়তো কোনো কারণে একটি বিষয় অনুসরণ করতে পারছিলেন না; দেখা গেল, সেটাই তিনি এখানে এসে আত্মস্থ করতে পারেন চমৎকারভাবে। অনুপ্রাণিত হন ইতিবাচক জীবনদৃষ্টিতে। সুস্থ জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন। এমন উদাহরণ একটি দুটি নয়, অসংখ্য।

ইফতেখার আলম (ছদ্মনাম)। চাকরি করেন তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠানে। চল্লিশ না পেরোতেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। একপর্যায়ে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত হলেন তিনি। সবকিছু অনুসরণও করছিলেন বেশ আন্তরিকতার সাথে। নিয়মিত মেডিটেশন, হাঁটা, ব্যায়ামের পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসে আমূল পরিবর্তন আনলেন। সমস্যা শুধু একটাই– সারাদিনে প্রচুর সিগারেট খেতেন তিনি। স্কুলজীবনের এ অভ্যাসটি থেকে কোনোভাবেই তিনি বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না।

একদিন গ্রুপ কাউন্সেলিং পর্ব চলছিলো। হার্ট ক্লাবের কয়েকজন সদস্য গ্রুপ করে বসেছেন। যথারীতি খোলামেলা আলাপ আলোচনা শুরু হলো– তাদের কে কী ভাবছেন, কতটা উপকৃত হচ্ছেন, কারো কোনো সমস্যা আছে কি না ইত্যাদি। ইফতেখার আলম বললেন, সবকিছুই তিনি ভালোভাবে পারছেন, ধূমপানটাই কেবল এখনো বাদ দিতে পারছেন না। এ থেকে যে বেরিয়ে আসা সম্ভব, সেটাই তিনি কোনোভাবে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

এবার কথা বলতে শুরু করলেন সেই গ্রুপেরই একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য আবদুল মালেক (ছদ্মনাম)। আন্তর্জাতিক শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। এখন অবসর জীবনযাপন করছেন। তিনিও একসময় চেইন স্মোকার ছিলেন। তার প্রতিদিন সিগারেট লাগতো কমপক্ষে দু-তিন প্যাকেট। তিনি বলতে শুরু করলেন তার জীবনের সেই দিনটির কথা, যেদিন তিনি শেষবারের মতো ধূমপান করেছিলেন। শুনুন তার বয়ানেই–

"আন্তর্জাতিক শ্রম আইন বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই বিভিন্ন মিটিং সেমিনারে যেতাম। এরকমই একটি সেমিনার হচ্ছিলো লন্ডনে। আমি সেই

সেমিনারে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছিলাম। সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটি হোটেলের অডিটরিয়ামে। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিলো সেদিন। এর মধ্যে প্রায় প্রতি ৩০/৪০ মিনিট পর পর সেমিনার রুম থেকে বেরিয়ে আসছিলাম সিগারেট খাওয়ার জন্যে। এভাবে কয়েকবার বেরও হলাম।

চতুর্থ বা পঞ্চমবার যখন হোটেলের বাইরে এসে সিগারেট ধরাচ্ছি, আমার হঠাৎ মনে হলো, এত গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে, আমি তার প্রেসিডেন্ট অথচ সিগারেট খাওয়ার জন্যে বার বার আমাকে মিটিং থেকে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে। আমার হাতের এই সিগারেট তো তাহলে আমার চেয়েও বেশি ভূমিকা রাখছে এই মিটিংয়ে। মিটিংয়ের প্রেসিডেন্ট তবে কে? আমি না কি এই সিগারেট? মুহূর্তে এক ধরনের বিবমিষা জেগে উঠলো আমার ভেতর। প্রচণ্ড এক বিতৃষ্ণায় আমার হাতের সিগারেটটা ফেলে দিলাম। পকেট থেকে বের করে দামি সিগারেট কেস্ আর লাইটারটা ছুঁড়ে ফেললাম হোটেলের লনে যে ফোয়ারা ছিলো, সেই পানিতে।

তারপর থেকে কোনোদিন আমার আর ধূমপানের আগ্রহ হয় নি। ওই একটি ঘটনায় এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো যে, সিগারেটের নেশা আমার পুরোপুরি টুটে গেল।"

আবদুল মালেক সাহেব তার জীবনের এই উপলব্ধিময় ঘটনাটির কথা যখন বলছিলেন, তার সতীর্থরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন। ধূমপানের অভ্যাস থেকে তিনি যে এমন এক ঝটকায় বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, এজন্যে তার মুখে সেদিন ছিলো এক পরিতৃপ্ত মানুষের হাসি। বিষয়টি সেদিন কাউন্সেলিং সেশনে অংশ নেয়া সদস্যদের আপ্লুত করে। মজার ব্যাপার হলো, তার পরের সপ্তাহেই ইফতেখার আলম এসে সুসংবাদ দিলেন, তিনি ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। আবদুল মালেক সাহেবের ঘটনাটি ভীষণ আলোড়িত করেছে তাকে। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সদস্য এবং কাউন্সিলরবৃন্দ অভিনন্দন জানালেন ইফতেখার আলমকে।

এভাবেই সঙ্ঘবদ্ধ পথ চলা আর পারস্পরিক পরামর্শ এবং সহযোগিতা মানুষকে পৌঁছে দেয় তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। তাই আপনিও অংশ নিন এ অনন্য কার্যক্রমে। পরিবার বা পরিচিতমণ্ডলে কোনো হৃদরোগী থাকলে বা হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে চান যারা, তাদেরও উৎসাহিত করুন এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে। তাতে সবাই মিলে একসাথে এগিয়ে যাওয়া হবে অনেক সহজ এবং ফলপ্রসূ।

১২

শোকরগোজার হোন ॥
এগিয়ে যান সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে

ইতোমধ্যেই আমরা বুঝতে পেরেছি, হৃদরোগ যতটা না হৃৎপিণ্ডের রোগ, তার চেয়ে বেশি এটি হৃদয়ের রোগ। এ রোগের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের মন এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভালোমন্দ নানা বিষয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় তাই হৃদরোগ একটি সাইকোসোমাটিক ডিজিজ বা মনোদৈহিক রোগ। জীবনের একটু গভীরে তাকালে আমরা দেখবো, মনোদৈহিক রোগব্যাধি আর এ ধরনের সমস্যাগুলোর আসল বিষফোঁড়াটা লুকিয়ে আছে জীবন সম্পর্কে আমাদের ভুল ও অবিদ্যাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গিতেই।

অধিকাংশ মানুষ আজ ঘুরপাক খাচ্ছে না-শুকরিয়া আর ভুল জীবনাচারের বৃত্তে। ঘুরেফিরে সবখানেই একই হাহাকার–নাই নাই, খাই খাই, পাই পাই। এত পাই তবু চাই, আরো চাই। শুধু চাই আর চাই। এই নিদ্রাহীন চাওয়ার যেন কোনো শেষ নেই। জীবনের প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারছি না–প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি অনেক দিয়েছো। আমি কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ কৃতজ্ঞচিত্ততা বা শুকরিয়ার অভাব ঘটেছে আমাদের জীবনে। আর এই না-শুকরিয়ার কারণ হলো–নেতিবাচকতা, ক্রমাগত অন্যের সাথে তুলনা, বস্তুর মাঝে সুখ খুঁজে ফেরা ইত্যাদি।

না-শুকরিয়ার পরিণতিতে অশান্তি হতাশা অস্থিরতা ভয় বিষণ্নতা মানুষের জীবনকে নানা দিক থেকে আঁকড়ে ধরে। জীবন একসময় হয়ে ওঠে দুঃসহ, ক্লান্তিকর এবং রোগগ্রস্ত। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পড়ে হৃদযন্ত্রেও।

তাই একটি সুস্থ সুন্দর ও আনন্দময় জীবনের জন্যে চাই শুকরিয়া ও ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি। শুকরিয়া আমাদের জীবন থেকে নেতিবাচকতার বিষবৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটিত করে, চিরতরে দূর করে অশান্তির সমস্ত জঞ্জাল।

চাই শুকরিয়া ॥ সঠিক জীবনদৃষ্টি

আমাদের চারপাশে যত সফল মানুষ আমরা দেখি, তাদের সাফল্যের রহস্য খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, তারা প্রত্যেকেই একেকজন শোকরগোজার বা ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ। কেউ তা অনুসরণ করছেন সচেতনভাবে, কিংবা কারো জীবনের সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই এটি। সর্বাবস্থায় শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞচিত্ততার বোধই প্রতিদিন একটু একটু করে তাদেরকে নিয়ে যায় সাফল্য ও নিরাময়ের পথে।

কারণ, একজন শোকরগোজার মানুষের দৃষ্টি সবসময় 'কী আছে', সেদিকে। ফলে তার শক্তি, ক্ষমতা আর জীবন-উপকরণ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সজাগ ও সচেতন। জীবনের যেকোনো পর্যায় থেকে তিনি শুরু করতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন কর্মোদ্যমী ও সফল। তার সাফল্যের আনন্দ-অনুরণনই তাকে যাবতীয় কষ্ট দুঃখ বিষণ্নতা ও স্ট্রেস থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সুখী জীবনের পথে তিনি পায়ে পায়ে এগিয়ে যান।

সবসময় বলুন, বেশ ভালো আছি

আপনার জীবনের সব ধরনের প্রাপ্তি ও সাফল্য এবং আপনার যা আছে তার সবকিছুর জন্যেই আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ হোন। ধন্যবাদ জানান স্রষ্টাকে। গভীরভাবে তাকান নিজের দিকে। একটু ভাবলেই আপনি আপনার জীবনে পেয়ে যাবেন এমন অসংখ্য উপলক্ষ, যার জন্যে আপনিও বলতে পারবেন, অন্য অনেকের চেয়ে আপনি অনেক ভালো আছেন।

তাই প্রতিদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই বলুন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ/ প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ/ থ্যাংক্স গড, একটা নতুন দিনের জন্যে। ভেতর থেকে অনুভব করুন শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞচিত্ততার শাশ্বত অনুভূতি। কুশল বিনিময়ে এবং দিনে যখনই সময় পান, বলুন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ, বেশ ভালো আছি। আপনি সত্যিই ভালো থাকবেন।

যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুরু করুন

শুকরিয়ার প্রকাশ হলো, যা আছে, যতটুকু আছে সেখান থেকেই শুরু করা। পথে নামলে পথই আসলে পথ দেখায়। শোকরগোজার মানুষ যা আছে তা নিয়েই শুরু করে দিতে পারেন, পথে নামতে পারেন, তিনি পথও পেয়ে যান।

তাই নিরাময় বা সাফল্য–যে পথেই এগোতে চান–যা আছে তা নিয়েই নেমে পড়ুন, যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুরু করুন। কারণ, যে উদ্যোগ নেয়, সচেতন প্রচেষ্টা চালায়, স্রষ্টার রহমত সবসময় তার সাথেই থাকে।

শোকরগোজার হোন ॥ আপনি সুস্থ থাকবেন

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা স্রষ্টার করুণাধারায় সিক্ত। বেঁচে থাকার কত অসংখ্য জীবন-উপকরণ আমরা আপনা-আপনিই পেয়ে যাচ্ছি, উপভোগ করছি। শুধু অক্সিজেনের কথাই যদি ধরি, দিনে কত হাজারবার দম নিচ্ছি, কত লক্ষ-কোটি অক্সিজেন অণু আমাদের বেঁচে থাকায় ভূমিকা রেখে চলেছে। এভাবে যদি হিসেব করি, দিন মাস বছর যুগ মিলিয়ে পুরো জীবনভর এমনি কতভাবে আমরা প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট! কিন্তু আমরা কজনই-বা এজন্যে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই?

আপনি দম নিতে পারছেন, এখনো বেঁচে আছেন–এটাই তো হওয়া উচিত শুকরিয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। আপনি বেঁচে আছেন মানে হলো, আপনার সামনে রয়েছে এক অপার সম্ভাবনার জগৎ। জীবনে কিছু করার সুযোগ রয়েছে আপনার।

আপনি যখন ভেতর থেকে শুকরিয়া জানাতে পারবেন, কৃতজ্ঞচিত্ত হতে পারবেন, তখন আপনার ভেতরের টেনশন অশান্তি অস্থিরতা ভয় দূর হতে শুরু করবে। কমতে থাকবে স্ট্রেস সৃষ্টিকারী ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। আপনার হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাসুন, প্রাণখুলে হাসুন

প্রতিদিন অন্তত কয়েকবার নির্মল আনন্দে প্রাণখুলে হেসে উঠুন। হাসি দিয়েই পৃথিবীর সব সুখ আর আনন্দের শুরু। হাসি সত্যিই আপনার শুকরিয়ার প্রকাশ ঘটায়। হাসির নিরাময়-ক্ষমতা এখন অসংখ্য গবেষণায় বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। দেখা গেছে, সবসময় হাসিখুশি থাকেন যারা তাদের রক্তে স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ কম থাকে।

'লাফ আফটার লাফ : দি হিলিং পাওয়ার অব হিউমার' বইটির লেখক ডা. রেমন্ড মুদি বলেন, আমার পেশাগত জীবনে এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি, যেখানে রোগীরা হাসি দিয়েই সুস্থতা অর্জন করেছেন। হাসি সত্যিই ব্যথানাশক এবং দীর্ঘায়ু ত্বরান্বিত করে। এছাড়াও টেনশনের ফলে শরীরের স্নায়ু ও পেশিতে যে সংকোচন সৃষ্টি হয়, প্রাণবন্ত হাসিতে তা দূর হয়।

হাসি আপনাকে অনেক অযাচিত স্ট্রেস থেকে মুক্তি দেয়। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডা. উইলিয়াম ফ্রাই-এর মতে, এক মিনিট প্রাণখোলা হাসি কয়েক মিনিট গভীর শিথিলায়নের মতোই উপকারি। তাই একটি নির্মল আনন্দপূর্ণ হাসি দিয়ে শুরু হোক আপনার দিন।

প্রার্থনায় লীন হোন

আপনি যে ধর্মের অনুসারীই হোন, নিরাময় ও সুস্থতার জন্যে নিয়মিত প্রার্থনা করুন। আপনার কৃতজ্ঞতা আর হৃদয়ের আকুতি জানান স্রষ্টাকে। প্রার্থনা আপনার রোগমুক্তিতে সাহায্য করে। বাড়িয়ে তোলে সুস্বাস্থ্যের সম্ভাবনা।

খোদ পাশ্চাত্যেই একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, প্রার্থনা রোগমুক্তিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। দেখা গেছে, একই ধরনের অসুস্থতায় ভুগছেন–এমন রোগীদের মধ্যে যারা প্রার্থনা করেছেন কিংবা যাদের জন্যে প্রার্থনা করা হয়েছে তারা তুলনামূলক দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

আমেরিকায় ৫০টিরও বেশি মেডিকেল কলেজে হবু ডাক্তারদের পড়ানো হচ্ছে রোগ নিরাময়ে প্রার্থনার গুরুত্ব। শুধু তা-ই নয়, কীভাবে রোগীদের জন্যে প্রার্থনা করতে হবে, সেটিও শেখানো হচ্ছে তাদের। বিষয়টি এখন আমেরিকায় মেডিকেল কারিকুলামের অন্যতম অনুষঙ্গ। আপনিও তাই সুস্থতা ও রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনায় লীন হোন। নবীজী (স) বলেন, 'প্রতিটি রোগেরই নিরাময় রয়েছে। আল্লাহ পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ পাঠান নি, যার নিরাময় তিনি দেন নি।'

আত্মনিমগ্নতায় সৃষ্টি হোক শুকরিয়া ও আনন্দের প্লাবন

দিনের কিছুটা সময় নীরবে কাটান। মেডিটেশন করুন, ধ্যানমগ্ন হোন। ডুব দিন নিজের ভেতর। সুখময় ভাবনার টলটলে স্বচ্ছ জলে ভাসিয়ে দিন নিজেকে। অযাচিত রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ, বিষাদ আপনাকে ছেড়ে যাবে। আপনি ভারমুক্ত হবেন। সুস্থতা ও নিরাময়ের জন্যেই এটি দরকার।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, নিয়মিত মেডিটেশন করেন যারা, তাদের মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স দারুণভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আর মস্তিষ্কের এ অংশটি থেকেই উৎসারিত হয় আমাদের সুখ ও আনন্দের মতো ইতিবাচক আবেগগুলো। মেডিটেশনকালে ব্রেন থেকে নিঃসৃত হয় আনন্দবর্ধক সেরোটনিন ও এন্ডোরফিন নামক রাসায়নিক পদার্থ, যা দেহ-মনে চমৎকার সুখানুভূতি সৃষ্টি করে।

নিয়মিত মেডিটেশন আপনার শুকরিয়ার অনুভূতি বাড়িয়ে দেবে। গভীর আত্মনিমগ্নতায় আপনি লাভ করবেন শুকরিয়ার নতুন উপলব্ধি। হয়ে উঠবেন প্রশান্ত পরিতৃপ্ত এক সুখী মানুষ। এগিয়ে যাবেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন ও কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে।

মেডিটেশন ॥ শুকরিয়া

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির দরবার কক্ষে গিয়ে বসুন।

২. আপনি জানেন, শুকরিয়া মনকে প্রশান্ত করে। মুহূর্তে আপনার চিন্তার জগতকে বদলে দেয়। আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন বর্তমান উপকরণ সম্পর্কে। ভাবতে পারেন পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে। এবার এক এক করে তালিকা করুন–কী কী আছে আপনার? কোন কোন বিষয়ের জন্যে আপনি শোকরগোজার হবেন? আপনি কী কী পারেন? আপনার বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? নিজের দিকে না তাকিয়ে অন্যের দিকেই তাকাই আমরা। কিন্তু আপনি জানেন, অন্যের দিকে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনাকে তাকাতে হবে নিজের দিকে। যত নিজের দিকে তাকাবেন তত বিস্মিত হবেন। তত দেখবেন যাদের সাফল্য আপনাকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে তাদের প্রাপ্তির পেছনের সকল উপকরণ আপনারও আছে। যা দিয়ে আপনি অনায়াসে শুরু করতে পারেন।

৩. আজ যে আপনি সুস্থ দেহে ঘুম থেকে উঠেছেন, শুকরিয়া আদায় করুন তার জন্যে। গতকাল কয়েক লক্ষ মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। আপনি বেঁচে আছেন। কাজ করার, জীবনকে উপভোগ করার আরো একটি দিন পেয়েছেন। আপনার শোকরগোজার হওয়ার জন্যে এটাই যথেষ্ট। আপনার ঘরে পরের বেলার খাবার আছে, পরনে কাপড় আছে, রাতে ঘুমাবার একটা জায়গা আছে। আপনার সৌভাগ্যের জন্যে অভিনন্দন। কারণ আপনি পৃথিবীর বাকি ৭৫ ভাগ মানুষের চেয়ে বেশি বিত্তবান। আপনি এখনো দম নিতে পারছেন। ভাবুন, হাসপাতালের সেই অসহায় রোগীটির কথা যিনি দমও নিতে পারছেন না, যাকে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে।

দেহের কথাই ভাবুন। দেহে আছে পাঁচ শতাধিক মাংসপেশি, দুই শতাধিক হাড়, ৭০ থেকে ১০০ ট্রিলিয়ন দেহকোষ। প্রতিটি কোষে অক্সিজেন পৌঁছে যাচ্ছে শিরা ও ধমনীর ৬০ হাজার মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন দিয়ে। রয়েছে ফুসফুসের মতো রক্ত শোধনাগার। আপনার হার্ট কোনোরকম ক্লান্তি ছাড়াই প্রতিদিন প্রায় লক্ষবার স্পন্দনের মাধ্যমে ১৬শ গ্যালনের চেয়েও বেশি রক্ত পাম্প করে দেহকে সচল রাখছে। রয়েছে একজোড়া ছোট চোখ, যা দিয়ে বিশাল পৃথিবীকে দেখছেন আপনি। আপনার মস্তিষ্ক যেকোনো কম্পিউটারের চেয়েও কমপক্ষে ১০ লক্ষ গুণ শক্তিশালী। কম্পিউটারের

দামের অনুপাতে আপনার মস্তিষ্কের মূল্য কমপক্ষে পাঁচ হাজার কোটি টাকা।

৪. বিশ্বের প্রায় সাতশ কোটি মানুষের মধ্যে আপনি অনন্য। আপনার মতো হুবহু কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্রষ্টা আপনার মতো আর কাউকেই সৃষ্টি করেন নি। আপনাকে এমন কিছু মেধা দিয়েছেন যা আর কাউকে দেন নি। যত নিজের দিকে তাকাবেন তত দেখবেন আপনার সাফল্যের জন্যে যে যে উপকরণ প্রয়োজন তার সবই আপনার রয়েছে। এ উপকরণগুলো ব্যবহার করেই আপনি নির্মাণ করতে পারেন আপনার সাফল্যের পৃথিবী। আপনার জীবন শুরু করতে হবে আপনার যা আছে তা নিয়ে। প্রতিটি সফল মানুষ তার যা ছিলো, তা নিয়েই জীবন শুরু করেছেন। অতএব আপনিও শুরু করুন যা আছে তা নিয়ে।

৫. এবার অবলোকন করুন, কী আছে আপনার যা দিয়ে আপনি শুরু করবেন? বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যা আছে তার জন্যে। ভাবুন, শুকরিয়ার প্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আপনার অতৃপ্তি অস্থিরতা বিরক্তি ক্ষোভ সন্দেহ আশঙ্কা শূন্যতা হাহাকার আর বিষণ্নতাকে। শুকরিয়ার সাগরে আপনার সকল অতৃপ্তি অস্থিরতাগুলোকে ছোট ছোট দ্বীপ হিসেবে কল্পনা করুন। অবলোকন করুন, শুকরিয়ার প্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই দ্বীপগুলোকে। অস্থিরতা অশান্তি আশঙ্কা সন্দেহ ক্ষোভ সবকিছু ভেসে যাচ্ছে আপনার থেকে অনেক দূরে অনেক দূরে। আপনার মনে সৃষ্টি হয়েছে এক অভূতপূর্ব আনন্দ-অনুরণন। শুকরিয়ার প্লাবনে আপনি অনুভব করছেন কল্যাণশক্তির জাগরণ যা সকল অশান্তিকে প্রশান্তিতে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, রোগকে সুস্থতায় রূপান্তরিত করছে।

৬. জীবনে শুকরিয়ার গুরুত্বকে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন আপনি। শোকরগোজার মনই প্রশান্ত মন। প্রশান্ত মন সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে করণীয় বর্জনীয় সম্পর্কে। সহজেই সংযুক্ত হয়ে যায় শক্তির মূল উৎসের সাথে। শক্তির মূল উৎস থেকেই উৎসারিত হয় সাফল্যের ফল্গুধারা। সেজন্যে পৃথিবীর সকল ধর্মে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাই সবসময় বলুন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! ভোরে ঘুম ভাঙতে বলুন, 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ/ প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ/ থ্যাঙ্কস গড! বেশ ভালো আছি। প্রতিদিন আমি সবদিক দিয়ে ভালো হচ্ছি, সফল হচ্ছি, সুখী হচ্ছি।' সবসময় শোকরগোজার মানুষদের সংস্পর্শে থাকুন, সৎসঙ্ঘে থাকুন যা আপনাকে সবসময় প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত রাখবে।

৭. ০ থেকে ৭ গণনা করে স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

১৩

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবে আসুন

সঠিক জীবনদৃষ্টি, মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার হৃদরোগ নিরাময় করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এ আধুনিক ধারণাকে গত দুদশক ধরে দেশে জনপ্রিয় করে তুলেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। আর এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে হৃদরোগে আক্রান্ত অসংখ্য মানুষ পেয়েছেন স্বস্তি ও মুক্তি। হৃদরোগ প্রতিরোধে সচেতন হয়ে উঠেছেন শত সহস্র মানুষ।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব ॥ যাত্রা শুরু

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে সবাইকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে আরো সুপরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে কাজ শুরু করেছে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব। এপ্রিল, ২০১০-এ কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর মহাসচিব জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক। জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ডা. মো. নজরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক বলেন, বাংলাদেশে এখন বিশ্বমানের হৃদরোগ চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটাই একমাত্র সমাধান নয়। হৃদরোগ থেকে পরিপূর্ণ নিরাময়ের জন্যে দরকার জীবনধারা পরিবর্তন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, মেডিটেশন বা রিলাক্সেশনের মাধ্যমে চাপমুক্ত জীবনযাপন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এসব ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে তুলছে বলে আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশন

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের উদ্যোগে মে, ২০১০ থেকে পরিচালিত হচ্ছে হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম। প্রতি মাসে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুদিনের বিশেষ ওরিয়েন্টেশন। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২৫টিরও বেশি ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিয়েছেন দেড় সহস্রাধিক মানুষ।

ওরিয়েন্টেশনে রয়েছে :

- করোনারি হৃদরোগের জন্যে দায়ী ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি এবং অবৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি
- হৃদরোগ নিরাময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা
- হৃদরোগের কারণ শনাক্তকরণ এবং হৃদরোগ নিরাময়ে বিশেষ মেডিটেশন
- সুস্থ হৃৎপিণ্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় কোয়ান্টাম ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ
- সঠিক জীবনদৃষ্টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা এবং শুকরিয়ার বিশেষ মেডিটেশন

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশন ॥ প্রথম ব্যাচের অংশগ্রহণকারীরা

সাপ্তাহিক ফলো-আপ ও কাউন্সেলিং সেশন

ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিয়েছেন যারা, সেসব সদস্যের অংশগ্রহণে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাপ্তাহিক ফলো-আপ ও কাউন্সেলিং সেশন।

এ কার্যক্রমে রয়েছে :

- ☐ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও মেডিটেশন
- ☐ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং এবং চেক-আপ
- ☐ কোয়ান্টাম ব্যায়াম অনুশীলন
- ☐ গ্রুপ কাউন্সেলিং বা পারস্পরিক অভিজ্ঞতা-অনুভূতি বিনিময়

সাপ্তাহিক ফলো-আপ সেশনে অংশ নিয়ে গ্রুপ কাউন্সেলিং-এ মিলিত হন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সদস্যরা

বিশেষ কার্যক্রম ॥
বৈজ্ঞানিক সেমিনার ও দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব-এর উদ্যোগে ১৯ অক্টোবর, ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার ও দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ। 'হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে চাই সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবনাচার' শীর্ষক এ সেমিনারে আলোচনা করেন দেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞবৃন্দ। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সদস্যসহ এতে অংশ নেন প্রায় দুসহস্রাধিক মানুষ।

১৯ অক্টোবর ২০১২ কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব আয়োজিত হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে বৈজ্ঞানিক সেমিনার-এ আলোচকবৃন্দ। (বাঁ থেকে) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আহমদ মরতুজা চৌধুরী, বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশনের চীফ কনসালটেন্ট ডা. হাসনাইন নান্না, গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক, জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান, মাদাম নাহার আল বোখারী, কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কনসালটেন্ট ডা. সাবরীনা ইয়াসমীন ও কো-অর্ডিনেটর ডা. মনিরুজ্জামান

হৃদরোগ নিরাময়ে বিশেষ মেডিটেশন সিডি

২১ জানুয়ারি, ২০১১ জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় হৃদরোগ নিরাময়ের বিশেষ মেডিটেশন সিডির প্রকাশনা অনুষ্ঠান। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব প্রকাশিত মেডিটেশন সিডির মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলাদেশে ধূমপান বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ ও প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, মেডিটেশন ও জীবনাচার পরিবর্তনের মাধ্যমে হৃদরোগমুক্ত হওয়ার জন্যে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সদস্যদের আমি অভিনন্দন জানাই। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

২১ জানুয়ারি, ২০১১ জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'হৃদরোগ নিরাময়ে বিশেষ মেডিটেশন' সিডির মোড়ক উন্মোচন করেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম ও প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে ৪টি বিশেষ মেডিটেশন

গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের কণ্ঠে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়েছে হৃদরোগ নিরাময়ের ৪টি বিশেষ মেডিটেশন, যা করোনারি হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে।

সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস অনুসরণের পাশাপাশি এ মেডিটেশনগুলোর নিয়মিত চর্চা আপনার হৃৎপিণ্ডের ব্লকেজ দূর করতে সাহায্য করবে। গবেষণায় দেখা গেছে, মেডিটেশনকালে সুস্থ হৃৎপিণ্ডের কল্পনা হৃৎপিণ্ডকে প্রাণবন্ত করার সাথে সাথে রক্তের অতিরিক্ত কোলেস্টেরলকেও স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে।

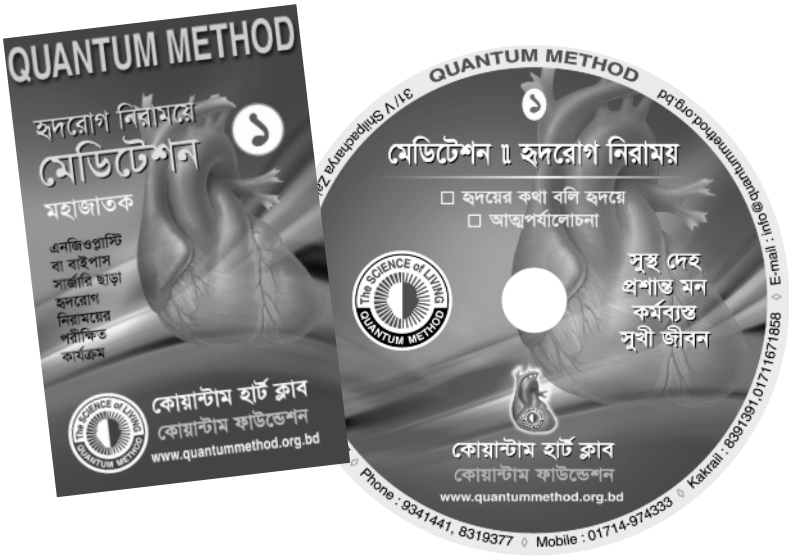

হৃদয়ের কথা বলি হৃদয়ে

এ মেডিটেশনে জীবনে প্রথমবারের মতো নিজের হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযোগ স্থাপন করবেন আপনি। গভীর আত্মনিমগ্নতায় কথা বলবেন আপনার হৃৎপিণ্ডের সাথে। আপনার সামনে একে একে উন্মোচিত হবে আপনার হৃদরোগের কারণগুলো। ফলে এসব ভুল জীবন-অভ্যাস শুধরে নিতে পারবেন খুব সহজেই।

আত্মপর্যালোচনা

ক্রমাগত আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে সুস্থ হৃৎপিণ্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় জীবন-অভ্যাসগুলো অনুসরণ করা আপনার জন্যে অনেক সহজ হয়ে উঠবে। প্রতিদিন একটু একটু করে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যাবেন আপনি।

হৃদরোগ নিরাময়

নিয়মিত নিরাময়ের কল্পচিত্র বা মনছবি দেখে গত দুদশকে অসংখ্য মানুষ পেয়েছেন হৃদরোগ থেকে মুক্তি। হৃদরোগ নিরাময়ের একটি পরীক্ষিত ও কার্যকর মনছবি হিসেবে এটি ইতোমধ্যেই প্রমাণিত। এ মেডিটেশনের মাধ্যমে মনের অফুরন্ত শক্তিভাণ্ডারকে ব্যবহার করে আপনিও এগিয়ে যাবেন সুস্থতার পথে।

সুস্থ হৃৎপিণ্ড

এ মেডিটেশনে রয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক ধারণার আলোকে হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, যা প্রতিদিনের অনুসরণীয়।

আপনিও আসুন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব-এ।
সম্পৃক্ত হোন হৃদরোগ প্রতিরোধ ও
নিরাময় কার্যক্রমে।
সুস্থতা আর প্রশান্তির জয়ানুরণনে
ভরে উঠুক আপনার জীবন।

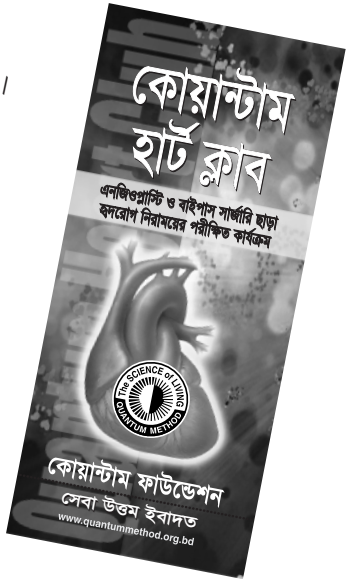

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব
বাড়ি– ২৩, ব্লক– এ, রোড– ১
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
ফোন : ৮৩৯৬৮১৫, ০১৭৪০-৬৩০৮৫৬
E-mail : heartclub@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম

কোয়ান্টাম আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের বিজ্ঞান। সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে মেধা ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করাই এর লক্ষ্য। স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে সৃষ্টির সেবায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জাতিতে রূপান্তরিত করাই এর মনছবি। কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে সমাজের সর্বস্তরের লাখো মানুষ অশান্তিকে প্রশান্তিতে, রোগকে সুস্থতায়, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। কোয়ান্টাম চর্চার মাধ্যমে আপনিও বদলে দিতে পারেন আপনার জীবন।

www.quantummethod.org.bd